কুহক

হুমায়ূন আহমেদ

ঘরের বাইরে বড়ো বড়ো করে লেখা—"রুগীদের বিশ্রামকক্ষ। নীরবতা কাম্য"। দশ ফুট বাই দশ ফুট বর্গাকৃতি ঘর। বেতের এবং প্লাস্টিকের চেয়ারে ঠাসাঠাসি। কাঠের একটা টেবিলে পুরনো ছেঁড়া কিছু সিনেমা পত্রিকা। তের-চৌদ্দ জন রুগী বসে আছে, সবাই নিঃশব্দ, শুধু একজন গোঙানির মতো শব্দ করছে, বড়ো বড়ো নিশ্বাস নিচ্ছে।

এ্যাসিস্টেন্ট জাতীয় এক লোক বিরক্ত গলায় বলল, 'চুপ করে থাকেন না ভাই। কুঁ কুঁ করছেন কেন? কুঁ কুঁ করলে ব্যথা কমবে?'

রুগী কাতর গলায় বলল, 'একটু তাড়াতাড়ি করেন।'

'এর চেয়ে তাড়াতাড়ি হবে না। পছন্দ হলে থাকেন। পছন্দ না হলে চলে যান।'

এ্যাসিস্টেন্টের নাম মাসুদ। বয়স ত্রিশ। মুখভর্তি বসন্তের দাগ। কটকটে হলুদ রঙের একটা শার্ট তার গায়ে। কিছুক্ষণ পরপর সে নাক ঝাড়ছে। তার মূল কাজ এক্সরে প্লেটে নাম্বার বসিয়ে রুগীদের এক্সরে রুমে পাঠিয়ে দেয়া। সে এই কাজের বাইরেও অনেক কাজ করছে। নাম লেখার সময় সব রুগীকেই খানিকক্ষণ ধমকাচ্ছে, রুগীর সঙ্গে এক্সরে রুমে ঢুকছে, এক্সরে অপারেটরকে একটা ধমক দিচ্ছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে কেউ কোনো প্রতিবাদ করছে না। কারণ সবাই জেনে গেছে এই লোকটির হাতেই ক্ষমতা। এই এক্সরে ইউনিট আসলে সে-ই চালাচ্ছে। ডাক্তার একজন আছেন, তিনি চেম্বার বন্ধ করে বসে আছেন। রুগীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ নেই। এক্সরে প্লেট দেখে একটা রিপোর্ট লিখে দেন। দায়িত্ব বলতে এইটুকুই।

আজ ডাক্তার সাহেব সেই দায়িত্বও পালন করছেন না। অল্পবয়স্ক কামিজ-পরা একটি মেয়ে ঘণ্টা দুই হল তাঁর কাছে বসে আছে। ডাক্তার সাহেব দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। বন্ধ দরজা ভেদ করে দু' বার খিলখিল হাসির শব্দ পাওয়া গেল।

মাসুদ সেই হাসির শব্দে মুখ কুঞ্চিত করে বলল, 'শালার দুনিয়া! প্রেম শুরু হয়ে গেছে।' কথাগুলো সে নিচু গলায় বলল না। শব্দ করেই বলল। এতে বোঝা গেল সে কারোর পরোয়া করে না। তার প্রতি রুগীদের যে প্রাথমিক বিরক্তি ছিল, তাও খানিকটা কাটল। যে তার মুনিবের প্রতি সরাসরি এমন কথা বলে সে এ্যান্টি-এস্টাবলিশমেন্টের লোক। সবার সহানুভূতি তার প্রতি।

নিশানাথ বাবু আট নম্বর স্লিপ হাতে বসে আছেন। একসময় তাঁর ডাক পড়ল। তিনি প্রেসক্রিপশন হাতে উঠে গেলেন।

মাসুদ কাঁচের দেয়ালের ওপাশে বসেছে। রেলের টিকিটের ঘুমটি-ঘরের মতো ছোট্ট জানালা দিয়ে তিনি প্রেসক্রিপশন বাড়িয়ে দিলেন।

মাসুদ বলল, 'নাম বলেন।'

'নিশানাথ চক্রবর্তী।'

'হিন্দু নাকি?'

নিশানাথ হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন, যদিও বুঝতে পারলেন না এই প্রশ্ন করার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে। অসুখের আবার হিন্দু-মুসলমান কি ?

'হয়েছে কী আপনার ?'

'মাথায় যন্ত্রণা।'

'মাথায় যন্ত্রণা তো পেরাসিটামল খেয়ে শুয়ে থাকেন। এক্সরে কী জন্যে ?'

নিশানাথ বাবু ইতস্তত করে বললেন, 'ডাক্তার এক্সরে করতে বলল, সাইনাস আছে কি-না দেখতে চান।'

মাসুদ মুখ বিকৃত করে বলল, 'কিছু একটা হলেই এক্সরে। আরে বাবা এই যন্ত্র যখন ছিল না, তখন কি রুগীর চিকিৎসা হত না ? এই সব হচ্ছে পয়সা কামাবার ফন্দি, বুঝলেন ?'

নিশানাথ কিছু বললেন না। এই রাগী ছেলেটির সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। হয়তো আবার ধমক দেবে। এক্সরে করতে এসে এতবার ধমক খাবার কোনো মানে হয় না।

মাসুদ খাতায় নাম তুলতে তুলতে বলল, 'সামান্য পেটব্যথা হলে ডাক্তাররা কী করে, জানেন ? এক্সরে, আলট্রাসনোগ্রাম, এন্ডোসকপি, ব্লাড, ইউরিন—শালার দুনিয়া ! এইসব না করে একটা ডাব খেয়ে শুয়ে থাকলে কিন্তু পেটব্যথা কমে যায়। যান, ভেতরে যান।'

নিশানাথ বাবু ভেতরে ঢুকলেন। ভয়ে ভয়ে ঢুকলেন। তাঁর ভয় করছে কেন তাও ঠিক বুঝতে পারছেন না।

এক্সরে রুমে আলো কম। তাঁর চোখ ধাতস্থ হতে সময় লাগছে। ব্যাপারস্যাপার দেখে তিনি খানিকটা ভড়কেও গেছেন। অতি আধুনিক যন্ত্র। শরীরের যে-কোনো অংশের এক্সরে করা যায়। কম্পুটারাইজড ব্যবস্থা। ছবি নেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিগেটিভ তৈরি হয়ে বের হয়।

মাসুদ নিশানাথ বাবুর সঙ্গে ঢুকেছে। নিশানাথ বাবু বললেন, 'ব্যথা লাগবে নাকি ?'

মাসুদ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল, 'আগে কখনো এক্সরে করান নি ?'

'ছোটবেলায় একবার করিয়েছিলাম—বুকের এক্সরে।'

'ব্যথা পেয়েছিলেন ?'

'জ্বি না।'

'তখন ব্যথা পান নি, তাহলে এখন পাবেন কেন ? এক্সরে কিছুই না। এক ধরনের রেডিয়েশন, লাইট। মাথার ভেতর দিয়ে চলে যাবে, টেরও পাবেন না। হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?'

'কী করব ?'

'শুয়ে পড়ুন।'

'কোথায় শুয়ে পড়ব ?'

'আরে কী যন্ত্রণা ! এই বজলু, এঁকে শুইয়ে দে।'

বজলু এক্সরে মেশিনের অপারেটর। সে এসে নিশানাথ বাবুকে কোথায় যেন শুইয়ে দিল। তিনি ক্ষীণ গলায় বললেন, 'খুব ঠাণ্ডা লাগছে, ভাই।'

মাসুদ বলল, 'এয়ারকন্ডিশন্ড ঘর, তাই ঠাণ্ডা লাগছে। আপনি খুব যন্ত্রণা করছেন। চুপচাপ থাকেন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

বজলু এসে সিসার পাতে তৈরি একটা জিনিস নিশানাথ বাবুর ঘাড়ের উপর রাখল। তিনি শুয়েছেন উপুড় হয়ে। কিছু দেখতে পারছেন না, তবে বুঝতে পারছেন, ঘড়ঘড় শব্দ করে ভারি একটা যন্ত্র তাঁর মাথার কাছে চলে আসছে। তিনি সেখান থেকেই বললেন, 'ভয় লাগছে।'

মাসুদ কড়া গলায় ধমক দিল, 'কচি খোকা নাকি আপনি যে ভয় লাগছে ? নড়াচড়া করবেন না, চুপচাপ শুয়ে থাকুন।'

'নিশ্বাস কি বন্ধ করে রাখব ?'

'যা ইচ্ছা করুন।'

মাসুদ বজলুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঝামেলা শেষ কর তো। একজনকে নিয়ে বসে থাকলে হবে না।'

বজলু বোতাম টিপল। ছোট্ট একটা অঘটন তখন ঘটল। প্যানেলে একটি লাল বাতি জ্বলে উঠল। যার অর্থ কোথাও কোনো ম্যালফাংশান হয়েছে। বজলুর কোনো ভাবান্তর হল না, কারণ এই অতি আধুনিক যন্ত্রটি যে-কোনো ম্যালফাংশানে আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যায়। নির্ধারিত রেডিয়েশনের এক 'পিকো রেম' বেশি ডোজও যাবার কোনো উপায় নেই।

মাসুদ বলল, 'কী হয়েছে ?'

বজলু বলল, 'ম্যালফাংশান। আরেকটা প্লেট দিতে হবে।'

মাসুদ বলল, 'শালার যন্ত্রণা !'

ঠিক তখন বজলু অস্ফুট শব্দ করল। কারণ বড়ো ধরনের কিছু ঝামেলা হয়েছে। মেশিন বন্ধ হয় নি। 'স্ট্যান্ড-বাই' বাটনের লাল আলো জ্বলে নি। ডিজিটাল মিটারের সংখ্যা দ্রুত পাল্টাচ্ছে। রেডিয়েশন এখনো যাচ্ছে। বজলুর গলা শুকিয়ে গেল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল। কত রেডিয়েশন গেল ? ২৫০ রেম (REM) ? কী সর্বনাশ ! বুড়ো মানুষটা বেঁচে আছে তো ?

এ রকম হবে কেন ? কেন এরকম হবে ? এখন কী করা ?

বজলু 'স্টপ' বাটন টিপল। যন্ত্রটির সমস্ত কার্যকলাপ এতে বন্ধ হবে। 'স্টপ' বাটন পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ করে দেবে। পাওয়ার থাকবে শুধু মেকানিক্যাল অংশে। রেডিয়েশন ইউনিটে থাকবে না।

আশ্চর্য ! 'স্টপ' বাটন টেপার পরও রেডিয়েশন বন্ধ হল না। বজলুর হাত কাঁপতে লাগল। সে মনে মনে বলল, 'ইয়া রহমানু, ইয়া রাহিমু।'

মাসুদ বলল, 'কী হল ?'

বজলু বলল, 'রুগীকে তাড়াতাড়ি সরান। রেডিয়েশন যাচ্ছে।'

'কি বলছ ছাগলের মতো ?'

'আল্লাহ্‌র কসম।'

বজলু 'স্ট্যান্ড-বাই' বাটন টিপে আবার 'স্টপ' বাটনে চলে গেল। লাভ হল না। রেডিয়েশন কন্ট্রোল নবে হাত দিল। কিছু একটা করা দরকার। মাথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। রুগীকে সরানও যাচ্ছে না। রুগীকে সরাতে হলে রেডিয়েশন সোর্স সরাতে হবে। তাও সরান যাচ্ছে না।

মাসুদ ছুটে গেল ডাক্তার সাহেবের ঘরে।

কামিজ-পরা মেয়েটি এখনো আছে। সে সম্ভবত মজার কোনো গল্প বলছিল। তার মুখ হাসি-হাসি। ডাক্তার সাহেবও হাসছেন। দরজা 'নক' না-করে ঢোকা ঠিক হয় নি। মাসুদ গ্রাহ্য করল না।

কাঁপা গলায় বলল, 'তাড়াতাড়ি আসেন স্যার।'

রেডিওলজিস্ট কাটা কাটা গলায় বললেন, 'কতবার বলেছি হুট করে ঢুকবে না।'

'আপনি আসেন তো স্যার।'

'কেন ?'

'ঝামেলা হয়েছে। বিরাট ঝামেলা।'

ডাক্তার সাহেব এক্সরে রুমে ঢুকে দেখলেন—সব ঠিকঠাক। মেশিন বন্ধ। রহমান কপালের ঘাম মুছছে। নিশানাথ বাবু এখনো শুয়ে আছেন।

মাসুদ কানে কানে ডাক্তার সাহেবকে ঘটনাটা বলল। ডাক্তারের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'কত রেডিয়েশন পাস করেছে ?'

বজলু জবাব দিল না। আবার মাথার ঘাম মুছল। তার সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। প্রচণ্ড পিপাসা পেয়েছে। ডাক্তার সাহেব ডিজিটাল মিটারে সংখ্যা দেখলেন। রেডিয়েশনের পরিমাণ দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। রুগী এর পরেও বেঁচে আছে কী করে ?

নিশানাথ বাবু বললেন, 'শেষ হয়েছে ?'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'জ্বি জ্বি শেষ। শেষ, ভাই আপনি উঠে বসুন। মাসুদ, ওঁকে উঠিয়ে বসাও।'

মাসুদকে উঠিয়ে বসাতে হল না। নিশানাথ বাবু নিজেই উঠে বসলেন। নিচু গলায় বললেন, 'কোনো ঝামেলা হয়েছে ?'

মাসুদ শুকনো গলায় বলল, 'কোনো ঝামেলা হয় নি। একটু দেরি হল আর কি, যন্ত্রপাতির কারবার !'

নিশানাথ বাবু বললেন, 'কোনো ব্যথা পাই নাই।'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আসুন তো আমার সঙ্গে, আসুন।'

'বাসায় চলে যাব। দেরি হয়ে গেছে।'

'একটু বসে যান। চা খান এক কাপ।'

'মাথাটা কেমন খালি খালি লাগছে।'

'ও কিছু না। রেস্ট নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

ডাক্তার সাহেব নিশানাথ বাবুকে তাঁর ঘরে নিয়ে বসালেন। কামিজ-পরা মেয়েটি এখনো আছে। তার নাম নাসিমা। আজ তার জন্মদিন। সে অনেকদিন ধরে ভাবছে আজকের দিনটি অন্য রকমভাবে কাটাবে। যার সঙ্গে গল্প করতে ভালো লাগে, শুধু তার সঙ্গেই গল্প করবে। ফরহাদ নামের এই ডাক্তারের সঙ্গে গল্প করতে তার ভালো লাগে। শুধু যে ভালো লাগে তাই নয়, অসম্ভব ভালো লাগে। যখন তিনি থাকেন না, নাসিমা মনে মনে তাঁর সঙ্গে গল্প করে। নাসিমা জানে, কাজটা ভালো হচ্ছে না, খুব খারাপ হচ্ছে। তার দূর সম্পর্কের খালাতো ভাই ডাক্তার ফরহাদ বিবাহিত। দু'টি ছেলেমেয়ে আছে। ফরহাদ সাহেবের স্ত্রী, যাকে সে এ্যানি ভাবি বলে—তিনিও চমৎকার একজন মানুষ।

নাসিমা জানে, এই চমৎকার পরিবারে সে ধীরে ধীরে একটা সমস্যার সৃষ্টি করছে। আগে এ্যানি ভাবি তার সঙ্গে অনেক গল্প করতেন। এখন দেখা হলে শুকনো গলায় বলেন—কি—ভালো ? বলেই মুখ ফিরিয়ে নেন। যেন তার সঙ্গে কথা বলা অপরাধ, সে একজন অস্পৃশ্য মেয়ে।

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'নাসিমা, তুমি বাসায় চলে যাও।'

নাসিমার চোখে পানি এসে গেল। আজ তার জন্মদিন। স্কলারশিপের জমানো সব টাকা নিয়ে সে এসেছে। ফরহাদ ভাইকে নিয়ে সে চাইনিজ খাবে। একটা শাড়ি কিনবে। ফরহাদ ভাইকে বলবে শাড়ির রঙ পছন্দ করে দিতে। তারপর ঠিক সেই রঙের একটা শার্ট সে ফরহাদ ভাইয়ের সঙ্গে কিনবে।

'নাসিমা, আমার জরুরি কাজ আছে। তুমি এখন যাও। তোমাদের কলেজ কি আজ বন্ধ ?'

নাসিমা জবাব দিল না। মুখ জানালার দিকে ফিরিয়ে নিল, কারণ চোখ বেয়ে গালে পানি এসে পড়েছে। ডাক্তার সাহেব তা দেখতে পেলেন না। নাসিমা প্রায় ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার প্রচণ্ড ইচ্ছা করছে কোনো একটা চলন্ত ট্রাকের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে, কিংবা কোনো একটা দশতলা দালানের ছাদে উঠে সেখান থেকে ঝাঁপ দিতে।

নিশানাথ বাবু চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। মাঝে মাঝে জিভ বের করে ঠোঁট ভেজাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর পর বড়ো বড়ো করে নিশ্বাস নিচ্ছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে তাঁর বড়ো ধরনের কোনো কষ্ট হচ্ছে।

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আপনার নামটা জানা হল না।'

নিশানাথ বাবু চমকে চোখ মেলে তাকালেন। মনে হচ্ছে তিনি ডাক্তার সাহেবের প্রশ্ন ঠিক বুঝতে পারছেন না।

'আমাকে বলছেন ?'

'জ্বি।'

'কী বলছেন ?'

'আপনার নাম জানতে চাচ্ছিলাম।'

'নিশানাথ। আমার নাম নিশানাথ।'

'শরীরটা কেমন লাগছে ?'

'ভালো।'

'কিছু খাবেন ?'

'না। বাসায় যাব।'

'বাসা কোথায় ?'

'মালীবাগে।'

'বয়স কত আপনার ?'

'ঠিক জানি না। পাঁচপঞ্চাশ-ষাট হবে।'

'ও আচ্ছা—শরীরটা এখন কেমন লাগছে ?'

'ভালো।'

নিশানাথ বাবু খানিকটা বিস্ময় বোধ করলেন। এই লোক সারাক্ষণ তাকে শরীর কেমন শরীর কেমন জিজ্ঞেস করছে কেন ? তাহলে কি তিনি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন ? কিংবা এক্সরে নেয়ার সময় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন ?

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'মালীবাগে কি আপনার নিজের বাড়ি ?'

'না। আমার এক ছাত্রের বাড়ি। আমি ঐ বাড়িতে থাকি। আর আমার ছাত্রের ছেলে-মেয়ে দুটোকে পড়াই।'

'ও আচ্ছা। আপনার নিকট-আত্মীয়স্বজন কে কে আছেন ?'

'তেমন কেউ নেই। যাঁরা আছেন—ইন্ডিয়ায় চলে গেছেন।'

'আপনি যান নি কেন ?'

'ইচ্ছা করল না। আমি এখন উঠি ?'

'আরে না, আরেকটু বসুন, চা খান।'

নিশানাথ বাবু বসলেন। তাঁর খুব ক্লান্তি লাগছে। কেমন যেন ঘুম পাচ্ছে। চা চলে এল। তিনি চায়ে চুমুক দিলেন—কোনো রকম স্বাদ পেলেন না। তবু ছোট ছোট চুমুক দিতে লাগলেন, এখন না খাওয়াটা অভদ্রতা হয়।

বজলু ডাক্তার সাহেবকে একটা কাগজ দিয়ে গেছে। সেখানে লেখা কত ডোজ রেডিয়েশন এই রুগীর মাথার ভেতর দিয়ে পাস করেছে। সংখ্যাটির দিকে তাকিয়ে ডাক্তার সাহেব ঢোক গিললেন। এ কী ভয়াবহ অবস্থা !

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আর কোনো এক্সরে নেয়া হয় নি তো ?'

'জ্বি না। তবে যন্ত্র এখন ঠিক আছে।'

'ঠিক থাকুক আর না থাকুক, আর কোনো এক্সরে যেন না করা হয়।'

'জ্বি আচ্ছা।'

নিশানাথ বাবু বললেন, 'আমি এখন উঠি ?'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আমি ঐ দিক দিয়েই যাব। আপনাকে নামিয়ে দেব। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে।'

নিশানাথ বাবু ডাক্তারের ভদ্রতায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কী অসাধারণ একজন মানুষ ! আজকালকার দিনে এ রকম মানুষের সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে।

গাড়িতে উঠতে উঠতে ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আমার কার্ডটা রাখুন। টেলিফোন নাম্বার আছে। কোনো অসুবিধা হলে টেলিফোন করবেন।'

নিশানাথ বাবু অবাক হয়ে বললেন, 'কি অসুবিধা ?'

'না, মানে—বয়স হয়েছে তো। এই বয়সে শরীর তো সব সময় খারাপ থাকে। পরিচয় যখন হয়েছে তখন যোগাযোগ রাখা। আপনি শিক্ষক মানুষ।'

নিশানাথ বাবুর হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হল। কী অসম্ভব ভদ্র এই ডাক্তার ! এঁকে ধন্যবাদের কিছু কথা বলা দরকার। বলতে পারলেন না। শরীরটা খুব ক্লান্ত লাগছে। তিনি গাড়ির পেছনের সিটে বসে ঝিমুতে লাগলেন।

বাসায় ফিরে শরীরটা আরো খানিকটা খারাপ হল। নিজের ঘরে ঢুকে অবেলায় ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নটা ঠিক স্পষ্ট নয়, আবার স্পষ্টও : ছোট্ট একটা ঘর। ঘরে একটা মেয়ে একা একা বসে আছে। মেয়েটিকে তিনি আগে কখনো দেখেন নি। কিন্তু তিনি তার নাম জানেন। মেয়েটার নাম নাসিমা, সে কলেজে পড়ে। তার আজ জন্মদিন। এ রকম খুশির দিনেও তার মন খুব খারাপ। সে খুব কাঁদছে।

দীর্ঘ স্বপ্ন। তবে এই স্বপ্নে কোনো কথাবার্তা নেই। এই স্বপ্নের জিনিসগুলি স্থির, কোনো নাড়াচড়া নেই ! যেন কয়েকটা সাদাকালো ফটোগ্রাফ। আবার ঠিক সাদাকালোও নয়। এক ধরনের রঙ আছে, সেই রঙ পরিচিত নয়। ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

২

বাড়ির নাম 'পদ্মপত্র'।

বিশাল কম্পাউন্ডের ভেতর বাগানবাড়ির মতো বাড়ি। ঢাকা শহরের মাঝখানে জমিদারি সময়কার এক বাড়ি। বাড়ির আদি মালিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়কার রিডার ড. প্রশান্ত মল্লিক। তাঁর খুব গাছপালার শখ ছিল। যেখানে যত বিচিত্র গাছ পেয়েছেন তার সবই এনে লাগিয়েছিলেন। দিনমানে গাছের কারণে অন্ধকার হয়ে থাকত। লোকজন তখন এই বাড়ির নাম দিল জঙ্গলাবাড়ি। ড. মল্লিকের বৃক্ষপ্রীতি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তেই লাগল। তাঁর খানিকটা মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণও দেখা দিল। ঘুম হ'ত না, নিজের তৈরি বাগানে সারা রাত হাঁটতেন এবং গাছের সঙ্গে ল্যাটিন ভাষায় কথা বলতেন। ড. মল্লিক ল্যাটিন ভাষায়ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পর তাঁর সর্বকনিষ্ঠ কন্যাটিরও মাথা খারাপ হয়ে যায়। বাড়ির নাম তখন হয়ে যায় পাগলাবাড়ি।

ড. মল্লিকের স্ত্রী দেশবিভাগের তিন বছরের মাথায় বাড়ি বিক্রি করে তাঁর অপ্রকৃতস্থ কন্যাকে নিয়ে চলে যান জলপাইগুড়ি। এই বাড়ি তারপর চারবার হাতবদল হয়ে বর্তমানে আছে মহসিন সাহেবের হাতে। আগের বাড়ির কিছুই নেই। গাছপালার অধিকাংশই কেটে ফেলা হয়েছে। বাড়ির পেছনে জলজ গাছ লাগানোর জন্যে একটা ঝিলের মতো ছিল, সেই ঝিল ভরাট করে চার কামরার এল্ প্যাটার্নের ঘর করা হয়েছে। ঘরগুলিতে মহসিন সাহেবের ড্রাইভার, মালি এবং দারোয়ান থাকে। বছর দুই ধরে আছেন নিশানাথ বাবু।

নিশানাথ বাবু একসময় মহসিন সাহেবেরও প্রাইভেট টিউটর ছিলেন। অঙ্ক করাতেন। খুব যত্ন করেই করাতেন। পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে মজার মজার গল্প করতেন। মহসিন সাহেব শিশু অবস্থায় সেইসব গল্প শুনে মুগ্ধ ও বিস্মিত হতেন। তাঁর সেই বিস্ময়ের কিছুটা এখনো অবশিষ্ট আছে বলে নিশানাথ বাবুকে যত্ন করে নিজের বাড়িতে এনে রেখেছেন। নিশানাথ বাবুর দায়িত্ব সন্ধ্যার পর মহসিন সাহেবের পুত্র-কন্যাকে নিয়ে বসা, পড়া দেখিয়ে দেয়া। এই দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। দায়িত্বের বাইরে যা করেন তা হচ্ছে গাছপালার যত্ন। প্রায় সময়ই মালির সঙ্গে তাঁকেও নিড়ানি হাতে বাগানে বসে থাকতে দেখা যায়।

মহসিন সাহেবের এক ছেলে, দুই মেয়ে। বড়ো ছেলে তুষার ল্যাবরেটরি স্কুলে ক্লাস সিক্সে পড়ে। পড়াশোনায় মোটামুটি ধরনের, তবে সুন্দর ছবি আঁকে। দ্বিতীয় সন্তান—রাত্রি পড়ে ভিকারুননেসা স্কুলে ক্লাস ফাইভে। এই মেয়েটি অসম্ভব বুদ্ধিমতী। স্মৃতিশক্তিও অসাধারণ। কোনো জিনিস একবার পড়লে দ্বিতীয় বার পড়ার দরকার হয় না। মহসিন সাহেবের তৃতীয় সন্তান আলো—ভাইবোনদের মধ্যে সবচেয়ে রূপবতী। তার দিকে তাকালে চোখ ফিরিয়ে নেয়া মুশকিল। আলো এবং

রাত্রির বয়সের তফাত এক বছর। আলো জন্ম থেকেই মূক ও বধির। এই মেয়েটিকে নিয়ে বাবা-মা'র দুঃখের কোনো সীমা নেই।

মহসিন সাহেবের স্ত্রী দীপা মেয়েটিকে সারাক্ষণ চোখে-চোখে রাখেন। মাঝে মাঝে থমথমে গলায় বলেন, 'মা, তুই এত সুন্দর হচ্ছিস কেন ? তুই তো বিপদে পড়বি, মা।' আলো চোখ বড়ো বড়ো করে মা'র দিকে তাকিয়ে থাকে। মার কথা সে শুনতে পায় না, মা কী বলছেন বুঝতেও পারে না। মা'র কথা শেষ হওয়া মাত্র সে হাসে। সেই হাসি এতই মধুর যে দীপার ইচ্ছা করে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদতে।

রাত প্রায় আটটা বাজে। তুষার এবং রাত্রি ভিডিও গেম নিয়ে বসেছে। রাত্রি গত জন্মদিনে এই যন্ত্রটি উপহার হিসেবে পেয়েছে। অনেকগুলি খেলার ক্যাসেট আছে। তবে তাদের পছন্দ হয়েছে ঘোড়ার খেলাটা। খেলা শুরু হতেই টিভি পর্দায় দেখা যায় অনেক জীবজন্তুর মাঝখানে ল্যাসো হাতে এক ঘোড়সওয়ার বসে আছে। খেলার বিষয়টি হচ্ছে জীবজন্তু ধরা। কালো ছাগল তিন পয়েন্ট, সাদা হরিণ পঁচিশ পয়েন্ট, বসে থাকা বাঘ একশ' পয়েন্ট। জন্তুগুলি ধরা বেশ কঠিন, কারণ এরা দ্রুত দৌড়তে থাকে।

রাত্রির জয়স্টিকের কনট্রোল খুবই চমৎকার। সে পাঁচ হাজার পর্যন্ত করতে পারে। তুষার অনেক কষ্টে একবার এগারোশ' করেছিল। ছোট বোনের কাছে পরাজিত হবার লজ্জায় সে খানিকটা ম্রিয়মাণ। এখন খেলছে রাত্রি। তুষার ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে। ওদের থেকে অনেকটা দূরে সোফায় আধশোয়া হয়ে বসে আছে আলো। সেও গভীর মনোযোগে খেলা দেখছে।

দীপা ট্রেতে করে ছেলেমেয়েদের জন্যে দুধের গ্লাস নিয়ে ঢুকলেন। বিরক্ত গলায় বললেন, 'এখন গেম নিয়ে বসেছ কেন ? পড়াশোনা নেই ?'

রাত্রি খেলা বন্ধ না করেই বলল, 'স্যার আজ পড়াবে না মা। স্যারের শরীর ভালো না।'

দীপা বললেন, 'উনি পড়াবেন না বলেই তোমরা পড়বে না—এ কেমন কথা ? পরীক্ষায় খারাপ করবে তো।'

রাত্রি বলল, 'আমি কি কখনো খারাপ করেছি ?'

'কখনো কর নি বলেই যে ভবিষ্যতেও করবে না, তা তো না। না পড়লে কী-ভাবে ভালো করবে ?'

রাত্রি খেলা বন্ধ করে মা'র দিকে তাকিয়ে হাসল। মিষ্টি করে বলল, 'পড়তে যাচ্ছি মা।'

দীপা বললেন, 'আরেকটা কথা, তোমরা যখন খেলা নিয়ে বস, তখন আলোকে ডাক না কেন ? সে একা একা দূরে বসে থাকে। ওর নিশ্চয়ই খেলতে ইচ্ছা করে।'

তুষার বলল, 'ও খেলতে পারে না, মা।'

'না পারলে ওকে শিখিয়ে দেবে। তোমরা আছ কেন ? ওর বুঝি খেলতে ইচ্ছা করে না ? বেচারি একা একা দূরে বসে আছে।'

রাত্রি বলল, 'আমি ওকে ডেকেছি, মা। ও তো আসতে চায় না। ও আমাদের পছন্দ করে না।'

'কে বলল পছন্দ করে না ?'

'কাছে গেলে খামচি দেয়, এই দেখ খামচির দাগ।'

দীপা দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করে বললেন, 'ঠিক আছে। যাও, হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বস। দুধ টেবিলে রইল। পড়তে বসার আগে দুধ খেয়ে নেবে। ন'টা বাজতেই খেতে আসবে। আর শোন, তোমাদের স্যারের যে অসুখ—তোমরা কি তাঁকে দেখতে গিয়েছিলে ?'

রাত্রি বলল, 'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। না গেলে জানব কি করে যে তাঁর অসুখ। ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছেন। মাথায় খুব যন্ত্রণা।'

তুষার বলল, 'দারোয়ান ভাই বলেছেন, স্যারের মাথায় কুকুরের বাচ্চা হয়েছে। একবার তো তাঁকে কুকুর কামড়ে দিয়েছে, তাই। মেয়েদের যদি কুকুরে কামড় দেয় তাহলে তাদের পেটে বাচ্চা হয়, আর ছেলেদের যদি কামড়ায় তাহলে তাদের মগজে বাচ্চা হয়। খুব ছোট ছোট বাচ্চা। ইঁদুরের চেয়েও ছোট।'

দীপা খুব রাগ করলেন। নতুন দারোয়ানটা রোজই কিছু-না-কিছু উদ্ভট কথা বলবে। তাকে মানা করে দেয়া হয়েছে, তার পরেও এই কাণ্ড। তাছাড়া তার ঘরের পাশের ঘরে একজন অসুস্থ মানুষ পড়ে আছে, এই খবরটা তাঁকে জানাবে না ? ডাক্তার ডাকতে হতে পারে। বুড়ো মানুষ। হয়তো-বা হাসপাতালে নিতে হতে পারে। রাতে নিশ্চয়ই ভাত খাবেন না। পথ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। ঘরে চালের আটা আছে কিনা কে জানে ! থাকলে চালের আটার কয়েকটা রুটি করার কথা বলে দিতে হবে।

দীপা নিশানাথ বাবুকে দেখতে যাবার জন্যে রওনা হলেন। ইট-বিছানো রাস্তা অনেকখানি পার হতে হয়। দু'পাশে উঁচু হয়ে ঘাস জমেছে। এক সপ্তাহও হয় নি কাটা হয়েছে, এর মধ্যেই ঘাস এত বড়ো হয়ে গেল ! মালি কোনো কিছুই লক্ষ করে না। বর্ষাকাল সাপখোপের সময়। এই সময়ে বাগান পরিষ্কার না রাখলে চলে ?

নিশানাথ বাবুর ঘর অন্ধকার।

দীপা ভেতরে ঢুকে আলো জ্বাললেন। নিশানাথ বললেন, 'কে ?'

দীপা বললেন, 'চাচা, আমি দীপা।'

মহসিন নিশানাথ বাবুকে স্যার ডাকেন। তাঁর ছেলে-মেয়েরাও ডাকে স্যার। শুধু দীপা ডাকেন চাচা।

দীপাকে দেখে নিশানাথ বাবু উঠে বসলেন এবং কোমল গলায় বললেন, 'কেমন আছ গো মা ?'

'আমি ভালোই আছি। আপনি কেমন আছেন ? অসুখ নাকি বাধিয়ে বসেছেন !'

'তেমন কিছু না। জ্বর-জ্বর লাগছে। শুয়ে আছি।'

দীপা হাত বাড়িয়ে নিশানাথ বাবুর কপাল স্পর্শ করলেন। এই অসম্ভব ক্ষমতাবান মানুষের কন্যা এবং ধনবান মানুষের স্ত্রীর আন্তরিকতায় নিশানাথ বাবুর চোখে পানি আসার উপক্রম হল। দীপা বললেন, 'আপনার গায়ে তো বেশ জ্বর। মাথায় যন্ত্রণা কি আছে ?'

'আছে।'

'খুব বেশি ?'

'না, খুব বেশি না।'

'সাইনাসের জন্যে এক্সরে করাবার কথা ছিল যে, তা কি করিয়েছেন ?'

'হ্যাঁ। একটা ঝামেলা হয়েছে এক্সরেতে, আবার করাতে হবে।'

'রাতে আপনি কী খাবেন ?'

'কিছু খাব না, মা। উপোস দেব। উপোস দিলে ঠিক হয়ে যাবে।'

'চালের আটার রুটি করে দেব ?'

'আচ্ছা দাও।'

দীপা চলে যেতে পা বাড়িয়েছেন তখন নিশানাথ বাবু বললেন. 'একটু বস মা। এই দু'মিনিট।'

দীপা বিস্মিত হয়ে ফিরে এলেন। নিশানাথ বাবুর সামনের চেয়ারটায় বসলেন। নিশানাথ বাবু বললেন, 'বিশ্রী সব স্বপ্ন দেখছি, বুঝলে মা। মনটা খারাপ হয়ে গেছে।'

'কী স্বপ্ন'

'একই স্বপ্ন বারবার ঘুরে ফিরে দেখছি। একটা ঘরে কামিজ-পরা অল্পবয়স্ক একটা মেয়ে বসে আছে। মেয়েটার নাম—নাসিমা। নাসিমার মন খুব খারাপ। অথচ তার মন খুব ভালো থাকার কথা ছিল। সে একটা ট্রাকের সামনে লাফিয়ে পড়ল, অবশ্যি নাসিমার কিছু হল না।'

'আপনি চুপচাপ শুয়ে থাকুন। শরীর দুর্বল, এই জন্য স্বপ্নটপ্ন দেখছেন।'

নিশানাথ বাবু চুপ করে রইলেন। দীপা বললেন, 'আপনি কি আর কিছু বলবেন, চাচা ?'

'না, মা।'

'আমি তাহলে যাই ? দারোয়ানকে বলে যাচ্ছি সে গেট বন্ধ করবার পর আপনার রুমের সামনে শুয়ে থাকবে।'

'লাগবে না মা, শরীরটা এখন আগের চেয়ে ভালো লাগছে।'

নিশানাথ বাবু বিছানায় শুয়ে পড়লেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, 'বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে যাও, মা। আলো চোখে লাগছে।'

দীপা বাতি নিভিয়ে ঘর থেকে বেরুলেন। তাঁকে খানিকটা চিন্তিত মনে হল। নিশানাথ বাবুর স্বপ্নের ব্যাপারটা তাঁর ভালো লাগল না। তিনি কোথায় যেন শুনেছেন, মানুষ পাগল হবার আগে আগে একই স্বপ্ন বারবার দেখে।

রাতে নিশানাথ বাবুর প্রবল জ্বর এল। জ্বরের প্রকোপে তিনি থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। দারোয়ান তাঁর রুমের বাইরেই ক্যাম্প খাট পেতে শুয়েছে। নিশানাথ বাবু বেশ কয়েকবার ডাকলেন, 'এই কুদ্দুস, এ-ই। এ-ই কুদ্দুস মিয়া।' দারোয়ানের ঘুম ভাঙল না। দারোয়ানদের সাধারণত খুব গাঢ় ঘুম হয়।

ভোর হবার ঠিক আগে আগে তাঁর জ্বর ছেড়ে গেল। শরীরটাও কেমন ঝরঝরে মনে হল। সামান্য ক্লান্তির ভাব ছাড়া আর কোনো সমস্যা নেই। তিনি বাগানে বেড়াতে গেলেন। ভোরবেলার এই ভ্রমণ তাঁর কাছে বড়োই আনন্দদায়ক মনে হল।

সূর্য ওঠার পর হাত মুখ ধুতে গিয়ে অবাক হয়ে লক্ষ করলেন তাঁর মাথায় একটিও চুল নেই। এক রাত্রিতে মাথার সব চুল উঠে গেছে। কেন এরকম হল তিনি বুঝতে পারলেন না। কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাঁকে ! সামান্য চুল মানুষের চেহারা যে এতটা বদলে দিতে পারে, তা তিনি আগে কখনো ভাবেন নি। নিজেকে দেখে তাঁর নিজেরই খুব হাসি পেতে লাগল। তিনি প্রথমে মৃদু স্বরে তারপর বেশ শব্দ করেই হেসে উঠলেন। তাঁর হাসির শব্দে কৌতূহলী হয়ে কুদ্দুস উঁকি দিল। তার চোখে ভয়-মেশানো দৃষ্টি। কুদ্দুস বলল, 'কি হইছে মাস্টর সাব ?'

'কিছু হয় নি কুদ্দুস। হাসছি।'

নিশানাথ বাবুর হঠাৎ মনে হল, কুদ্দুস মনে মনে তাকে পাগল বলে ডাকছে। এরকম মনে হল কেন ? তিনি স্পষ্ট শুনলেন কুদ্দুস বলছে, 'আহা মানুষটা পাগল হইয়া যাইতেছে। আহা রে।'

'কুদ্দুস।'

'জ্বি।'

'তুমি মনে মনে কী ভাবছিলে ?'

'কিছু ভাবতাছিলাম না মাস্টর সাব। আফনের মাথার চুল বেবাক গেল কই ?'

'পড়ে গিয়েছে। আমাকে দেখতে কেমন অদ্ভুত লাগছে, তাই না কুদ্দুস ? মনে হচ্ছে আমি একটা ভূত। শ্যাওড়া গাছে থাকি।'

কুদ্দুস জবাব দিল না।

নিশানাথ আবার হাসতে শুরু করলেন। কুদ্দুস চোখ বড়ো বড়ো করে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

৩

তুষার এবং রাত্রির জন্যে আজ খুব শুভদিন।

আজ বাবা তাদের স্কুলে নামিয়ে দেবেন। মাসে একদিন মহসিন সাহেব তাঁর ছেলেমেয়েদেরকে স্কুলে নামিয়ে দেন এবং স্কুল থেকে ফেরত আনেন। ফেরত আনার সময় খুব মজা হয়। বাচ্চারা যা চায় তাই তিনি করেন। তুষার যদি বলে—বাবা আইসক্রিম খাব তাহলে তিনি আইসক্রিম পার্লারের সামনে গাড়ি দাঁড় করান। রাত্রি এক বার বলেছিল—সাভার স্মৃতিসৌধ দেখতে ইচ্ছা করছে বাবা। মহসিন সাহেব বলেছেন—চল যাই, দেখে আসি। তখন ঝমঝম বৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তায় পানি। মহসিন সাহেব তার মধ্যেও গাড়ি ঘুরিয়েছিলেন।

আজও নিশ্চয়ই এরকম কিছু হবে। রাত্রি ঠিক করে রেখেছে ফেরার পথে সে বাবাকে বলবে গল্পের বই কিনে দিতে। তুষার এখনো কিছু ঠিক করতে পারে নি। কী চাওয়া যায় সে ভেবে পাচ্ছে না। এই জন্যে তার খুব মনখারাপ।

গাড়ি ওঠার মুহূর্তে মহসিন সাহেব বললেন, 'আজ স্কুলে না গেলে কেমন হয় ?'

তুষার ভেবে পেল না—বাবা ঠাট্টা করছেন, না সত্যি সত্যি বলছেন।

মহসিন সাহেব বললেন, 'মাঝে মাঝে স্কুলপালানো ভালো। আমি যখন তুষারের মতো ছিলাম তখন স্কুল পালাতাম।'

রাত্রি বলল, 'সত্যি বাবা ?'

'হুঁ সত্যি।'

'স্কুল পালিয়ে কী করতে ?'

'মার্বেল খেলতাম। আমাদের সময় সবচেয়ে মজার খেলা ছিল মার্বেল। এখন আর কাউকে খেলতে দেখি না। তোমরা কেউ মার্বেল দেখেছ ?'

'না।'

'চল, দোকানে গিয়ে খুঁজব। যদি পাওয়া যায়, তোমাদের জন্যে কিনব। কীভাবে খেলতে হয় শিখিয়ে দেব। আজ সারা দুপুর মার্বেল খেলা হবে।'

আনন্দে তুষারের বুক কাঁপতে লাগল। আজ কী ভীষণ সৌভাগ্যের দিন ! স্কুলের ইংলিশ গ্রামার শেখা হয় নি। তার জন্যে আজ আর বকা খেতে হবে না।

রাত্রি অবশ্যি তুষারের মতো এত খুশি হল না। স্কুল তার খুব ভালো লাগে। স্কুলে তার দু'জন প্রাণের বন্ধু আছে। তাদের সঙ্গে কথা না বললে রাত্রির ভালো লাগে না।

মহসিন সাহেব বললেন, 'তোমরা যাও, আলোকে নিয়ে এস। ব্যাটালিয়ান নিয়ে রওনা হওয়া যাক।'

তুষার বলল, 'ও যাবে না, বাবা।'

'তুমি তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর। না জিজ্ঞেস করেই বলছ কেন যাবে না। যেতেও তো পারে।'

'কখনো তো যায় না।'

'যেতেও তো পারে। আমার কাছে নিয়ে এস, আমি বুঝিয়েসুজিয়ে রাজি করাব।'

আলো মাকে ছেড়ে কখনো কোথাও যায় না। এই বাড়ির দেয়ালের বাইরে পা ফেলতেই তার আপত্তি। বাধ্য হয়ে যদি কখনো যেতে হয় চোখ-মুখ শক্ত করে রাখে। একটু পরপর চমকে ওঠে। অচেনা কাউকে দেখলেই এমন ভাব করে যাতে মনে হয় সে কোনো একটি বিচিত্র কারণে ভয় পাচ্ছে।

মহসিন সাহেব খুব খুশি হলেন। কারণ আলো যেতে রাজি হয়েছে। গাড়িতে তিনি আলো-কে তাঁর পাশে বসালেন।

রাত্রি এবং তুষার বসল পেছনের সিটে। রাত্রি বলল, 'তুমি কিন্তু আস্তে গাড়ি চালাবে, বাবা। তুমি এত স্পিডে গাড়ি চালাও যে ভয় লাগে।'

'আজ রিকশার চেয়েও আস্তে চালাব।'

রাত্রি এবং তুষার দু' জনই খিলখিল করে হেসে উঠল। আলো মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। সে হাসির কোনো কারণ বুঝতে না পেরে অস্বস্তি বোধ করছে। আলোর মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কত মজার মজার ব্যাপার চারদিকে হয়, সে কিছু বুঝতে পারে না। তাকে কেউ বুঝিয়ে দিতেও চেষ্টা করে না। এই দু' জন এত হাসছে কেন ? আলোর কান্না পেতে লাগল। সে অবশ্যি কাঁদল না। চোখ-মুখ শক্ত করে বসে রইল।

মহসিন সাহেব বললেন, 'আজ আমি একহাতে গাড়ি চালাব। সাঁই সাঁই বন বন।'

রাত্রি বলল, 'আরেকটা হাত দিয়ে তুমি কী করবে বাবা ?'

'আরেকটা হাত আমি আলো মায়ের কোলে ফেলে রাখব।'

এই কথায় দু' জন আবার হেসে উঠল। আলো এদের হাসিহাসি মুখ গাড়ির ব্যাকভিউ মিররে দেখতে পাচ্ছে। তার আরো মন খারাপ হয়ে গেল। এরা এত আনন্দ করছে কেন ? গাড়ি চলতে শুরু করেছে। মহসিন সাহেব দু' হাতেই স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাচ্ছেন। স্লো স্পিডে তিনি গাড়ি চালাতে পারেন না। দেখতে দেখতে গাড়ি ফোর্থ গিয়ারে চলে গেল।

তুষার বলল, 'বাবা।'

'বল।'

'তুমি কি আজ সকালে স্যারকে দেখেছ, বাবা ?'

'না।'

'দেখলে তুমি হাসতে হাসতে মরে যেতে।'

'কেন ?'

'স্যারের মাথায় একটা চুলও নেই। সব পড়ে গেছে।'

'তাই নাকি ?'

'হুঁ। স্যারকে কী যে অদ্ভুত দেখাচ্ছে ! রাত্রি ফিক করে হেসে ফেলেছে। হাসাটা কি উচিত হয়েছে, বাবা ?'

'মোটেই উচিত হয় নি।'

'আমিও হেসেছি। তবে মনে মনে। কেউ দেখতে পায় নি।'

'তুমি খুবই বুদ্ধিমানের কাজ করেছ।'

'ওর সব চুল পড়ে গেল কেন, বাবা ?'

'বয়স হয়েছে তো, সেই জন্যে পড়ে গেছে। বয়স হলে মাথার চুল পড়ে যায়।'

'কেন পড়ে যায় ?'

'মাথার চুল হচ্ছে মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্যে। বুড়ো মানুষদের মাথা ঠাণ্ডা রাখার দরকার নেই, তাই চুল পড়ে যায়।'

'দাঁত পড়ে যায় কেন, বাবা ?'

'বুড়ো মানুষদের শক্ত খাবার খাওয়ার প্রয়োজন নেই, এই জন্যে দাঁতও পড়ে যায়।'

মহসিন সাহেব মিরপুর রোড ধরলেন। তিনি চিড়িয়াখানার দিকে যাচ্ছেন। চিড়িয়াখানা ব্যাপারটা তাঁর কাছে খুব অপছন্দের। আজ যাচ্ছেন ছোটমেয়ের জন্যে। একমাত্র চিড়িয়াখানায় গেলেই আলোর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

মহসিন সাহেব গাড়ির গতি আরো বাড়িয়ে দিলেন। তিনি লক্ষ করেছেন দ্রুতগতি তাঁকে চিন্তায় সাহায্য করে। যদিও এই মুহূর্তে তেমন কোনো চিন্তা তাঁর মাথায় নেই। অস্পষ্টভাবে নিশানাথ বাবুর কথা তাঁর মনে আসছে। দীপাও আজ সকালে চুল পড়ার কথা বলেছিল। লোকটির দিন বোধ হয় শেষ হয়ে আসছে। হঠাৎ ভালো-মন্দ কিছু হয়ে গেলে সমস্যা হবে। ডেড বডি কী করা হবে ? হিন্দুদের দেহ সৎকারের অনেক সমস্যা আছে বলে শুনেছেন। নিশানাথ বাবুর আত্মীয়স্বজন ঢাকায় কেউ আছেন কিনা জিজ্ঞেস করা হয় নি। জানা থাকা দরকার।

একজন ডাক্তার নিশানাথ বাবুকে দেখছেন।

ডাক্তারের কোনো প্রয়োজন ছিল না। তাঁর শরীর এখন ভালোই লাগছে, তবু দীপা ডাক্তার আনিয়েছেন। এখন দাঁড়িয়েও আছেন ডাক্তারের পাশে।

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আপনার অসুবিধা কী ?'

নিশানাথ বাবু বললেন, 'তেমন কোনো অসুবিধা নেই।'

ডাক্তার সাহেব বিস্মিত হয়ে দীপার দিকে তাকালেন। দীপা বললেন, 'দেখুন না হঠাৎ করে ওঁর মাথার সব চুল পড়ে গেল !'

'এটা এমন কিছু না। অন্য কোনো অসুবিধা না থাকলেই হল। আছে অন্য কোনো সমস্যা ?'

'জ্বি না, মাঝে মাঝে খুব মাথার যন্ত্রণা হয়।'

'এখনো হচ্ছে ?'

'জ্বি না।'

দীপা বললেন, 'ওঁর সাইনাসের সমস্যা আছে।'

'বেশি করে লেবুর সরবত খাবেন। ভিটামিন সি এইসব ক্ষেত্রে খুব উপকারী। ভিটামিন সি-কে এখন বলা হচ্ছে মিরাক্‌ল্ ভিটামিন।'

ডাক্তার সাহেবের বোধহয় বাড়ি যাবার তাড়া আছে, দ্রুত কাজ সারতে চাইছেন। দীপা বললেন, 'আপনি দয়া করে ওঁর প্রেশারটা একটু দেখুন।'

ডাক্তার সাহেব ব্যাগ খুলে অপ্রসন্ন মুখে প্রেশারের যন্ত্রপাতি বের করলেন। প্রেশার মাপার তাঁর কোনো ইচ্ছা ছিল না। এই ডাক্তার এ-বাড়িতে প্রথম এসেছেন। এঁদের ডাক্তার হচ্ছে দীপার ছোট বোন তৃণা। আজ তৃণাকে পাওয়া যায় নি। তার বোধহয় আবার হাসপাতালে নাইট ডিউটি পড়েছে।

'আপনার প্রেশার নর্ম্যাল। আপনার বয়সের তুলনায় খুবই নর্ম্যাল।'

দীপা বললেন, 'চাচা, আপনার অন্য কোনো সমস্যা থাকলে বলুন।'

নিশানাথ বাবু বললেন, 'আমার আর তো কোনো সমস্যা নেই, মা।'

'স্বপ্নের কথা বলুন।'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'কিসের স্বপ্ন ?'

দীপা বললেন, 'চাচা কি একটা স্বপ্ন যেন বারবার দেখছেন। বলুন না, চাচা। ডাক্তারদের কাছে কিছু গোপন করতে নেই।'

নিশানাথ বাবু বিব্রত গলায় বললেন, 'একটা মেয়ে—তার নাম নাসিমা। কামিজ পরা। মেয়েটার মন খুব খারাপ।'

ডাক্তার সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আপনি কি বলছেন কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

'স্বপ্নের কথা বলছি। মানে গুছিয়ে বলতে পারছি না। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। মানে...'

নিশানাথ বাবু থেমে গেলেন এবং অবাক হয়ে ডাক্তারের দিকে তাকালেন, কারণ কথা বলতে বলতে হঠাৎ তাঁর মনে হল এই ডাক্তারের নাম মাসুদুর রহমান। ডাক্তার সাহেবের স্ত্রীর নাম ইয়াসমিন। তাঁদের তিন ছেলে। বড় ছেলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পিছলে পড়ে হাতের একটা হাড় ভেঙে ফেলেছে। হাড়টা ঠিকমতো সেট হয় নি বলে ডাক্তার সাহেব খুব চিন্তিত।

নিশানাথ বাবু ভেবে পেলেন না—এইসব কথা তাঁর মনে আসছে কেন ? তিনি কি পাগল হয়ে যাচ্ছেন নাকি ? বোঝাই যাচ্ছে এসব তাঁর কল্পনা। ডাক্তার সাহেবের নাম নিশ্চয়ই মাসুদুর রহমান নয়। তাঁর স্ত্রীর নামও নিশ্চয়ই ইয়াসমিন নয়। অথচ তাঁর কাছে মনে হচ্ছে এটাই সত্যি। এ রকম মনে হবার কী মানে থাকতে পারে ?

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'স্বপ্নের ব্যাপারটা তো শেষ করলেন না।'

নিশানাথ বাবু বললেন, 'ঐ সব কিছু না, বাদ দিন। মাথা গরম হয়েছিল, তাই আজে-বাজে স্বপ্ন দেখেছি। এখন আর দেখি না।'

'আমি আপনাকে ট্রাংকুলাইজার দিচ্ছি। শোবার সময় একটা করে খাবেন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'কয়েক দিন বিশ্রাম নিন। ভালোমতো খাওয়াদাওয়া করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে। মাথার চুল নিয়ে মোটেও ভাববেন না। নানান কারণে মাথার চুল পড়ে যেতে পারে। এটা কিছুই না।'

ডাক্তার সাহেব ব্লাডপ্রেশারের যন্ত্রপাতি ব্যাগে ভরছেন। নিশানাথ বাবু আচমকা বললেন, 'ডাক্তার সাহেব, আপনার নাম কি মাসুদুর রহমান ?'

ডাক্তার সাহেব হাসিমুখে বললেন, 'জ্বি। আপনি কি আমাকে চেনেন ?'

'জ্বি, চিনি। আপনার ছেলের হাত জোড়া লেগেছে ?'

'লেগেছে। তবে একটু সমস্যা আছে বলে মনে হয়। আপনি কি আমার ছেলেকেও চেনেন নাকি ?'

নিশানাথ বাবু হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'ওকে অবিশ্যি এ পাড়ার সবাই চেনে। বড়ো যন্ত্রণা করে। আপনার সঙ্গে কখনো কোনো বেয়াদবি করে নি তো ?'

'জ্বি না।'

'কেউ যখন বলে আপনার ছেলেকে চিনি, তখনি একটু বিব্রত বোধ করি। ঐ দিন বাসার ছাদ থেকে কার মাথায় যেন পানি ঢেলে দিয়েছে। এগারো বছর বয়েস-এর মধ্যেই কি রকম দুষ্টু বুদ্ধি ! আচ্ছা যাই।'

ডাক্তার সাহেব চলে যাবার পর নিশানাথ বাবু প্রায় এক ঘণ্টা মূর্তির মতো বসে রইলেন। ব্যাপারটা কী হল তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। এই এক ঘণ্টায় আরেকটি বিচিত্র ব্যাপার ঘটল। নিশানাথ বাবুর সামনের পাটির দু'টি দাঁত পড়ে গেল। তাঁর দাঁতে কোনো সমস্যা নেই অথচ পাকা ফল যেভাবে পড়ে, ঠিক সেইভাবে দাঁত পড়ে গেল ! এর মানে কী ? কী হচ্ছে এসব ? তাঁর ভয় করতে লাগল। তিনি এক মনে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে লাগলেন।

জীব ও জড়ে যে-ঈশ্বর, জল ও অগ্নিতে যে-ঈশ্বর, যে-ঈশ্বর আকাশে ও পাতালে সেই ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ।

৪

তুষার এবং রাত্রি দু'জনই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তুষারের মুখ ভাবলেশহীন, তবে রাত্রি একটু পরপর কেঁপে উঠছে। হাসি থামানোর চেষ্টা। করছে। সে বুঝতে পারছে কাজটা খুব অন্যায় হচ্ছে, তবু নিজেকে সামলাতে পারছে না। স্যারকে কী অদ্ভুত যে দেখাচ্ছে। মাথায় একটা চুলও নেই। আবার সামনের পাটির দুটো দাঁত নেই। তাও সহ্য করা যেত, কিন্তু এখন তাদের পড়াবার সময় খুটখুট করে তিনটে দাঁত পড়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্যে চেহারাটা হয়ে গেল অন্য রকম।

নিশানাথ বাবু বললেন, 'হাসিস না।'

রাত্রি বলল, 'হাসি এলে কী করব ? তবে আপনাকে দেখে হাসছি না, স্যার। অন্য একটা ব্যাপারে হাসছি।'

'কী ব্যাপার ?'

'আছে একটা ব্যাপার। আমাদের স্কুলের একটা কাণ্ড।'

রাত্রি খুকখুক করে হাসছে। হাসি চাপার চেষ্টা করছে, পারছে না। তুষার বলল, 'ও কিন্তু আপনাকে দেখেই হাসছে, স্যার।'

'উঁহু। আমি স্যারকে দেখে হাসছি না। স্কুলের একটা ঘটনা মনে পড়েছে এই জন্যে হাসছি—হি-হি হি হি।'

রাত্রি যে মিথ্যা কথা বলছে নিশানাথ বাবু তা বুঝতে পারছেন। আগেও বুঝতে পারতেন। মিথ্যা কথা বললে রাত্রির গলা অন্য রকম হয়ে যায়। আজও তার গলা অন্য রকম হয়ে গেছে। তবে নিশানাথ বাবু গলার স্বরের পরিবর্তন থেকে নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন-এক পদ্ধতিতে জানতে পারছেন রাত্রি মিথ্যা বলছে। এই পদ্ধতি তিনি ব্যাখ্যা করতে পারবেন না, কারণ পদ্ধতিটি যে কী, তিনি নিজেও ঠিক জানেন না। যেমন আজকের কথাই ধরা যাক। ছেলে-মেয়ে দু'টি বসে আছে তাঁর সামনে। নিশানাথ বাবু কোনো এক জটিল প্রক্রিয়ায় ইচ্ছামতো এদের দু'জনের মাথার ভেতর ঢুকে যেতে পারছেন। মাথার ভেতরটা অনেকটা কুয়োর মতো। গহীন কুয়ো। এত গহীন যে ভয় হয়—এর বোধহয় কোনো শেষ নেই।

নিশানাথ বাবু জানেন না অন্যের মাথার ভেতর চলে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি কী। তিনি শুধু জানেন যে তিনি তা পারেন। সেই গহীন কূপের ভিতরে তিনি যখন নামেন তখন তাঁর রোমাঞ্চ বোধ হয়। কুয়োর দেয়ালগুলিতে থরে থরে কত কিছুই না সাজানো—মানুষের স্মৃতি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। কুয়োর গহীন থেকে উঠে আসে মানুষের চিন্তা, কল্পনা ও ভাবনা। একই সঙ্গে একজন মানুষ কত কিছু নিয়েই না ভাবতে পারে।

মানুষের মাথার ভেতরে ঢুকতে পারার এই অদ্ভুত ক্ষমতার ব্যাপারটি নিশানাথ দু' দিন আগে বুঝতে পেরেছেন। এই দু' দিনে অনেকের মাথার ভেতর তিনি উঁকি

দিয়েছেন। এ বাড়ির মালি, দারোয়ান, ড্রাইভার, রাস্তার ও-পাশে 'ভাই ভাই লন্ড্রি'র ছেলেটা, ডেল্‌টা ফার্মেসির রোগা লোক।

তিনি লক্ষ করেছেন একেক মানুষের জন্যে এই কুয়ো একেক রকম। কারও কারও কুয়ো আলোকিত। সেই সব কুয়োয় প্রবেশ করাও যেন এক গভীর আনন্দের ব্যাপার। এই যে শিশু দু'টি তাঁর সামনে বসে আছে তাদের মাথার ভেতরের কুয়ো দু'টি আলোয় ঝলমল করছে। সেখানে কিছুক্ষণ থাকাও গভীর আনন্দের ব্যাপার।

আবার সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের কুয়োও আছে। সেখানে গাঢ় অন্ধকার। সেইসব কুয়োয় আলোর লেশমাত্র নেই। কুয়োয় ঢুকলে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। আতঙ্কে অস্থির হতে হয়। আবার কারো কারো কুয়োয় অল্প কিছু অংশ শুধু আলোকিত, বাকিটা গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। এ সবের কী মানে ? পুরোটাই তাঁর কল্পনা নয় তো ?

রাত্রি বলল, 'স্যার আপনার দাঁত পড়ে যাচ্ছে কেন ?'

নিশানাথ বাবু বললেন, 'বুঝতে পারছি না। বয়স হয়েছে, সেই জন্যেই বোধহয় পড়ে যাচ্ছে।'

তুষার বলল, 'স্যার আপনি কি জানেন বয়স হলে কেন দাঁত পড়ে যায় ?'

'না, জানি না।'

'আমি জানি। বুড়ো লোকদের শক্ত খাবার খাওয়ার দরকার নেই, সেই জন্যে দাঁত পড়ে যায়।'

'কে বলল ?'

'আব্বু বলেছে।'

'ও আচ্ছা।'

'আব্বু সব কিছু জানে।'

নিশানাথ বাবু বললেন, 'ট্রানস্লেশন নিয়ে বস, তুষার। ট্রানস্লেশনে তুমি বড়োই কাঁচা।'

রাত্রি বলল, ট্রানস্লেশনে আমি খুব পাকা, তাই না স্যার ?'

নিশানাথ বাবু কিছু বললেন না। তুষার তার ট্রানস্লেশন নিয়ে বসল। তার মুখ অপ্রসন্ন। ইংরেজি তার অসহ্য লাগে। তার চেয়েও অসহ্য লাগে ট্রানস্লেশন। সে খাতা খুলল। বাড়ির কাজ করতে হবে—

> 'যখন রুগী মারা যাচ্ছে তখন ডাক্তার এলেন।'
> 'বাড়ি থেকে যখন বের হলাম তখন বৃষ্টি নামল।'
> 'যখন ঘণ্টা পড়ল তখন স্কুলে গেলাম।'

তুষার পেন্সিল কামড়াচ্ছে।

নিশানাথ বাবু বললেন, 'পারছ না ?'

'পারছি।'

রাত্রি বলল, 'ও মুখে বলছে পারছি, আসলে কিন্তু ও পারছে না।'

তুষার রাগী চোখে তাকাল। রাগ সামলে খাতার উপর ঝুঁকে পড়ল। আসলেই সে পারছে না। তার খুব কষ্ট হচ্ছে। নিশানাথ বাবু হঠাৎ লক্ষ করলেন তিনি তুষারের মাথার ভেতরে চলে এসেছেন। সেই গহীন কুয়োর মাঝামাঝি একটা জায়গায়। তুষারের কষ্টটা তিনি বুঝতে পারছেন। সে বাক্যগুলির ইংরেজি প্রতিশব্দ জানে, কিন্তু সাজাতে পারছে না। কোন শব্দটির পর কোন শব্দটি বসবে তা তার জানা নেই। আচ্ছা, তুষারের মাথার ভেতরে বসে কি তা ঠিক করে দেয়া যায় না ? এখান থেকে তাকে শেখানো কি সবচেয়ে সহজ নয় ? চেষ্টা করে দেখবেন নাকি ? এতে তুষারের কোনো ক্ষতি হবে না তো ?

নিশানাথ বাবু চেষ্টা করলেন। মুহূর্তের মধ্যে তুষার তা ধরে ফেলল। তুষারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে খাতার উপর ঝুঁকে পড়ে একের পর এক ট্রানস্লেশন করে যাচ্ছে।

রাত্রি বলল, 'স্যার, ও কি পারছে ?'

'হ্যাঁ পারছে।'

নিশানাথ বাবুর খুশি হওয়া উচিত, কিন্তু তিনি খুশি হতে পারছেন না। এই জটিলতার কিছুই তিনি বুঝতে পারছেন না। কোনো একজনের সঙ্গে আলাপ করলে কেমন হয় ? কার সঙ্গে আলাপ করবেন ? যাকেই তিনি বলবেন সে-ই তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। দীপা, দীপাকে কি বলা যায় না ? সে কি হাসাহাসি করবে ?

তুষার বলল, 'স্যার আমাকে আরো ট্রানস্লেশন দিন। আমার ট্রানস্লেশন করতে ভালো লাগছে।'

নিশানাথ বাবু বললেন, 'যখন অন্ধকার হয় তখন পাখিরা আকাশে ওড়ে।'

তুষার খাতায় ইংরেজিটা লিখছে। খাতা না দেখেও নিশানাথ বাবু বুঝতে পারলেন তুষার নির্ভুলভাবে ট্রানস্লেশনটা করবে। কারণ ইংরেজিটা সে ভাবছে, তিনি তাঁর ভাবনা বুঝতে পারছেন। এর মানে কী ? হে ঈশ্বর, এর মানে কী ? এর মানে কী ? এর মানে কী ?'

৫

আলো কি ঘুমুচ্ছে ?

দীপা বুঝতে পারছেন না। আলোর চোখ বন্ধ। একটা হাত মা'র গায়ে ফেলে রেখেছে। নিশ্বাস ভারি। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে সে ঘুমিয়ে পড়েছে, তবু দীপা নিশ্চিত হতে পারছেন না। তিনি ঘড়ির দিকে তাকালেন। এগারোটা দশ বাজে।

প্রায় আধ ঘণ্টার মতো হলো তিনি আলো-কে নিয়ে শুয়েছেন। আলো-র মাথায় বিলি কেটে দিয়েছেন। পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। এতক্ষণে তার ঘুম এসে যাওয়ার কথা।

তিনি খুব সাবধানে আলোর হাত ঘুরিয়ে বিছানায় উঠে বসলেন। মেয়ের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটা নিশ্বাস চাপলেন। এই মেয়ে তাঁকে বড়ো বিপদে ফেলেছে। অন্য এক ধরনের বিপদ, যে-বিপদের কথা বাইরের কাউকে বলা যাবে না। বিপদের ধরনটা বিচিত্র। সন্ধ্যা মেলবার পর থেকে আলো তার বাবাকে সহ্য করতে পারে না। দীপাকে মেয়ে নিয়ে আলাদা ঘরে ঘুমুতে হয়। সেই ঘরে মহসিন সাহেব উঁকি দিলে সে অন্য রকম হয়ে যায়। কঠিন চোখে বাবার দিকে তাকায়। শক্ত করে মা'কে চেপে ধরে। জান্তব এক ধরনের শব্দ করতে থাকে। মহসিন সাহেব দুঃখিত ও ব্যথিত হন। মন খারাপ করে বলেন, 'ও আমাকে দেখে এরকম করে কেন দীপা ?'

দীপা কাটান দিতে চেষ্টা করেন। কোমল গলায় বলেন, 'সব সময় তো করে না।'

'তা ঠিক। সব সময় করে না। শুধু রাতেই এমন করে। কারণটা কী ?'

'রাতে বোধ হয় সে বেশি ইনসিকিওর ফিল করে।'

'আমার তা মনে হয় না। আমার কী মনে হয়, জান ? আমার মনে হয়, সে কোনো এক রাতে আমাদের কিছু অন্তরঙ্গ ব্যাপার দেখে ফেলেছে। হয়তো ঐ ব্যাপারটা মনে গেঁথে আছে।'

'এসব নিয়ে তুমি মন খারাপ করো না। একটু বুদ্ধি হলেই ওরকম আর করবে না।'

'বুদ্ধি হচ্ছে কোথায় ? যত বয়স হচ্ছে ও তো দেখছি ততই...'

মহসিন কথা শেষ করেন না। মুখ অন্ধকার করে ফেলেন। দীপা কী করবেন বুঝতে পারেন না। বেচারা একা একা রাত কাটায়, এটা তাঁর ভালো লাগে না। পুরুষ মানুষ শরীরের ভালোবাসার জন্যে কাতর হয়ে থাকে। সেই দাবি মেটানো দীপার পক্ষে বেশির ভাগ সময়ই সম্ভব হয় না।

মাঝে মাঝে রাত এগারোটার দিকে মহসিন এই ঘরের দরজার পাশে এসে দাঁড়ান। কঠিন গলায় বলেন, 'দীপা ঘুমোচ্ছ ?'

দীপা বলেন, 'না, আসছি। ও বোধ হয় এখনো ভালোমতো ঘুমোয় নি।'

দীপা খুব সাবধানে আলোর হাত ছাড়িয়ে উঠতে চান। আলো সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠে ক্রুদ্ধ গর্জন করে ওঠে এবং দু'হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে। মহসিন ক্লান্ত গলায় বললেন, 'ওকে ঘুম পাড়াও। আমি শুয়ে পড়ছি।'

তিনি কিন্তু শুয়ে পড়েন না। ঘরে বাতি জ্বলে। চুরুটের গন্ধ অনেক রাত পর্যন্ত ভেসে আসে। দীপার বড়ো মন খারাপ লাগে। অথচ কিছুই করার নেই। যত বার তিনি উঠতে যান আলো তত বারই তাঁকে জাপটে ধরে।

আজ অবশ্যি আলো ঘুমোচ্ছে। ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছে গাঢ় ঘুম। হয়তো আজ জাগবে না। দীপা সাবধানে বিছানা থেকে নামলেন। বাতি নিভিয়ে নীল আলো জ্বেলে দিলেন। পাশের ঘরে ঢুকলেন।

মহসিন বিছানায় শুয়ে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি পড়ছিলেন। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললেন, 'আলো ঘুমোচ্ছে ?'

'হুঁ।'

'জেগে যাবে না তো ? একটা কোল বালিশ দিয়ে এসেছ ?'

'হুঁ।'

দীপা দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দিলেন। তাঁর অবশ্যি খুব অস্বস্তি লাগছে। মাঝরাতে এ ঘরে আসা, আস্তে আস্তে কথা বলা, ছিটকিনি লাগানো—সব কিছু মনে করিয়ে দেয় এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের পেছনের উদ্দেশ্যটি অন্য। বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে গল্প করতে করতে শরীরে পৌঁছানো এক ব্যাপার, আর এরকম প্রস্তুতি নিয়ে এগোন সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। এতে নিজেকে কেমন যেন ছোট মনে হয়।

দীপা অস্বস্তি বোধ করছেন। অস্বস্তি কাটানোর জন্যে তিনি অন্য গল্প শুরু করলেন, 'তোমার স্যারের দাঁত সব পড়ে যাচ্ছে, জান ?'

'না তো। দাঁত পড়ে যাচ্ছে ?'

'উপরের পাটিতে একটি দাঁতও এখন নেই।'

'বল কি ?'

'অদ্ভুত ব্যাপার না ? নিচের পাটিতে সব দাঁত আছে অথচ উপরের পাটির একটা দাঁতও নেই। তোমার কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে না ?'

'অদ্ভুত তো বটেই।'

তিনি তাঁর স্ত্রীর কথা এখন তেমন মন দিয়ে শুনছেন না। তিনি দীপাকে আদর করতে শুরু করেছেন। পুরুষদের সেই বিশেষ আদর যা দীপার একই সঙ্গে ভালো লাগে এবং ভালো লাগে না।

দীপা বললেন, 'বাতি নিভিয়ে দাও না। লজ্জা লাগছে।'

তিনি গাঢ় স্বরে বললেন, 'একটু লজ্জা-লজ্জা লাগলে ক্ষতি নেই কিছু। বাতি থাকুক। বাতি না থাকলে কী করে বুঝব যে আমি এমন রূপবতী একটি মেয়ের পাশে বসে আছি। অন্ধকারে সব মেয়েই দেখতে এক রকম।'

মহসিন ড্রেসিং টেবিলের আয়নার দিকে তাকালেন। দু'জনের ছায়া পড়েছে আয়নায়। দীপাকে কী সুন্দর লাগছে দেখতে ! বয়সের কারণে নিতম্ব কিছুটা ভারি হয়েছে, তাতে দীপার রূপ যেন আরো খুলেছে।

দীপা বলল, 'আয়নার দিকে তাকিও না। আমার ভীষণ লজ্জা লাগে।'

'লাগুক।'

মহসিন স্ত্রীর মুখে চুমু খেলেন আর তখনি আলো চিৎকার করে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে বন্ধ দরজায় এসে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দরজায় কিলঘুসি মারছে। দরজায় আঁচড়াচ্ছে, মাথা ঠুকছে। দরজায় ঝুলন্ত পর্দা দাঁত দিয়ে কুটিকুটি করে ফেলতে চেষ্টা করছে।

দীপা বললেন, 'মা আসছি, মা আসছি।'

আলো তাঁর কথা শুনতে পেল না। তার পৃথিবী শব্দহীন। সে প্রবল আতঙ্কে দিশাহারা।

দীপা চট করে দরজা খুলতে পারলেন না। কাপড় গুছোতে তাঁর সময় লাগছে। এই সময়ে আলো একটা তাণ্ডব সৃষ্টি করল। একতলা থেকে বাবুর্চি এবং কাজের মেয়েটা ছুটে এল। তুষার এবং রাত্রির ঘুম ভেঙেছে। রাত্রি ভয় পেয়ে তার ঘর থেকে চেঁচাচ্ছে—'কী হয়েছে ? আম্মু, কী হয়েছে ?'

দীপা দরজা খুললেন। আশ্চর্য ব্যাপার ! আলোর সমস্ত উত্তেজনার অবসান হয়েছে। সে কেমন যেন অবাক দৃষ্টিতে চারদিকে দেখছে। দীপা যখন তার হাত ধরলেন, তখনো সে অন্য বারের মতো মা'র উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল না, বরং এমন দৃষ্টিতে তাকাল যেন সে মাকে ঠিক চিনতে পারছে না। কিংবা বিরাট কোনো ঘটনা তার জীবনে ঘটে গেছে যার তুলনায় মা'র উপস্থিতি খুবই তুচ্ছ ব্যাপার।

দীপা বললেন, 'এমন হৈ-চৈ শুরু করলে কেন, মা মণি ? এ রকম কর কেন তুমি ?'

আলো দীপাকে অবাক করে ছুটে নিজের ঘরে চলে গেল। ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়। বালিশে মুখ গুঁজে মূর্তির মতো হয়ে গেল।

দীপা তার পেছনে পেছনে এলেন। আলোর পিঠে হাত রাখলেন। আলো কেঁপে কেঁপে উঠছে। দীপা গাঢ় স্বরে বললেন, 'কী হয়েছে মা, কী হয়েছে ?'

আলোর যে কী হয়েছে তা সে নিজেও জানে না। আর জানতে পারলেও মা-কে জানানোর সাধ্যও তার নেই। আজ সে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছে। তার একান্ত নিজস্ব জগৎ ভেঙে খানখান হয়ে গেছে।

সে ঘুমুচ্ছিল। ঘুমের মধ্যেই তার মনে হল মা পাশে নেই। যার গায়ে সে হাত রেখেছে সে মা নয়। মা'র গায়ের পরিচিত উষ্ণতা সে পাচ্ছে না। মা'র গায়ের ঘ্রাণও নেই। তার ঘুম ভেঙে গেল। মা পাশে নেই। সে একটা কোলবালিশ জড়িয়ে শুয়ে আছে। আতঙ্কে তার বুক ধক্ করে উঠল। সে অবশ্যি চেঁচিয়ে উঠল না। নিজেকে সামলে নিল। মা নিশ্চয়ই বাথরুমে। সে বিছানা থেকে বাথরুমে উঁকি দিল। বাথরুমের দরজা খোলা। সেখানে কেউ নেই। মা তাহলে পাশের ঘরে ? বাবার ঘরে ? কেন, বাবার ঘরে কেন ? তারা কী করে সেখানে ? কান্নায় তার বুক ফুলে ফুলে উঠছে। সে বাবার ঘরের দরজার পাশে দাঁড়াল। দরজায় অল্প ধাক্কা দিল। ভেতর

থেকে বন্ধ। কেন, ভেতর থেকে বন্ধ কেন ? মা তাকে একা একা এই ঘরে ফেলে রেখে চলে গেছে ? কেন সে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে ? কী করছে তারা দু'জন ?

আলো দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার মাথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। অসম্ভব রাগে তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। ইচ্ছা করছে পুরো বাড়িটা ভেঙে আগুন ধরিয়ে দিতে। দাঁত দিয়ে কামড়ে কুটিকুটি করে ফেলতে। ঠিক এরকম অবস্থায় কে একজন আলোর কাছে জানতে চাইল, 'কী হয়েছে তোমার ? তুমি এ রকম করছ কেন ?'

এই প্রশ্ন দু'টি সে কানে শুনল না। শব্দ সম্পর্কে তার ধারণা নেই। তার শব্দহীন জগতে হঠাৎ যদি কোনোক্রমে কিছু শব্দ ঢুকেও যায় সে তার অর্থ উদ্ধার করতে পারবে না। অথচ সে পরিষ্কার বুঝছে কেউ একজন জানতে চাইছে, 'কী হয়েছে তোমার ? তুমি এ রকম করছ কেন ?'

আলো তার উত্তরে বলতে চাইল, 'কে ? তুমি কে ?'

সে মুখে বলল না। মনে মনে ভাবল। এতেই কাজ হল। যে প্রশ্ন করেছিল সে তাকে সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আমি তোমাদের স্যার। আমি নিশানাথ।'

'আপনি কথা বলছেন আমার সাথে ?'

'হ্যাঁ।'

'কীভাবে কথা বলছেন ?'

'অন্য রকম ভাবে বলছি। কীভাবে বলছি আমি জানি না। তুমি এ রকম হৈ-চৈ করছ কেন ?'

আলো আবার বলল, 'আপনি কীভাবে কথা বলছেন ?'

'আমি জানি না কীভাবে বলছি।'

'অন্যরা আমার সঙ্গে কথা বলে না কেন ?'

'এই ভাবে কথা বলার পদ্ধতি অন্যরা জানে না। কিন্তু তুমি আমাকে বল। তুমি হৈ-চৈ করছ কেন ? দরজায় ধাক্কা দিচ্ছ কেন ?'

'আমার ভয় লাগছে, তাই এরকম করছি।'

'কোনো ভয় নেই।'

কথাবার্তার এই পর্যায়ে দরজা খুলে দীপা বের হয়ে এলেন।

রাত দুটোর মতো বাজে। আলো ঘুমুচ্ছে। গাঢ় ঘুম। দীপা তাঁর স্বামীর ঘরে। দু'জন অনেকক্ষণ ধরেই চুপচাপ বসে আছেন, যেন কারো কোনো কথা নেই।

মহসিন বললেন, 'কিছু একটা করা দরকার।'

দীপা কিছু বললেন না। বলার কিছু নেইও।

মহসিন বললেন, 'মূক-বধির ছেলে-মেয়ে তো আরো আছে, তারা সবাই তো এরকম না। তারা স্কুল কলেজে যাচ্ছে, পড়াশোনা করছে।'

দীপা বললেন, 'আলোও করবে।'

'আর করবে ! প্রাইভেট কোচ করার চেষ্টা করে তো দেখা গেল। লাভটা তাতে কী হল ?'

দীপা কিছু বললেন না। মূক-বধির স্কুলের একজন খুব নামি শিক্ষক তাঁরা রেখেছিলেন, যিনি আলো-কে পড়াশোনা শেখানোর চেষ্টা করবেন, অক্ষরপরিচয় করিয়ে দেবেন, 'লিপ রিডিং' শেখাবেন। কোনো লাভ হয় নি। আলো মাস্টারের সামনে পাথরের মতো মুখ করে বসে থাকে। মাস্টার সাহেব যতবার বলেন—'বল 'আ'। খুব সহজ। হাঁ কর। হাঁ করে কিছু বাতাস বের করে দাও। বাতাস বের করবার সময় এই জায়গাটা কাঁপবে।' তিনি হাত দিয়ে গলা দেখিয়ে দেন। মুখের সামনে এক টুকরো কাগজ রেখে বুঝিয়ে দেন 'আ' বললে কীভাবে কাগজটা কাঁপবে। আলো সব দেখে, কিন্তু কিছুই করে না। দু'দিন মাস্টার প্রাণান্ত চেষ্টা করলেন। তৃতীয় দিনে আলোর উপর খানিকটা রেগে গেলেন। তীব্র গলায় বললেন, 'যা বলছি কর।' বলার সঙ্গে সঙ্গ আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল মাস্টার সাহেবের উপর। হিংস্র পশুর ঝাঁপ। চেয়ার নিয়ে মাস্টার সাহেব উল্টে পড়ে গেলেন। আলো তাঁর হাত কামড়ে ধরল। রক্ত বের হয়ে বিশ্রী কাণ্ড। পড়াশোনার সেখানেই ইতি।

মহসিন বললেন, 'বসে আছ কেন ? যাও, ঘুমিয়ে পড়।'

দীপা ক্ষীণ গলায় বললেন, 'তুমি মেয়ের উপর রাগ করে থেক না।'

মহসিন বললেন, 'রাগ করব কেন ? মেয়ে কি আমার না ?'

'তাহলে এস, মেয়ের গালে একটু চুমু দিয়ে যাও।'

তিনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে এলেন। আলো ঘুমোচ্ছে। কী অদ্ভুত সুন্দর হয়েছে তাঁর এই মেয়ে ! কী ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে এর জন্যে কে জানে ? তিনি নিচু হয়ে মেয়ের গালে চুমু খেলেন।

আলো সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলল। এতক্ষণ সে জেগেই ছিল। দীপা ইশারায় বললেন, 'তুমি কি এতক্ষণ জেগে ছিলে ?'

আলো হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। দীপা বিস্মিত হয়ে তাকালেন। আলো ইশারায় বলল, সে আর কোনো দিন হৈ-চৈ চেঁচামেচি করবে না। এবং এই ঘরে সে একা একা থাকতে পারবে। আজকের চেঁচামেচির জন্যে তার খুব লজ্জা লাগছে।

দীপা স্বামীর দিকে তাকালেন। মেয়ের এই পরিবর্তন তাঁর কাছে খুবই অস্বাভাবিক লাগছে।

আলো আবার ইশারায় বলল, সে পড়াশোনা করতে চায়। এখন থেকে সে স্যারের কাছে পড়বে।

মহসিন বললেন, 'বেশ তো, আবার তোমার আগের ঐ স্যারকে খবর দেব।'

আলো বাবার কথা বুঝতে পারল না।

মহসিন দীপাকে বললেন, 'তুমি ওকে ইশারায় আমার কথা বুঝিয়ে দাও। ও কিছু বুঝতে পারছে না।'

দীপা আলোকে বুঝিয়ে দিলেন। আলো ইশারায় বলল, সে ঐ স্যারের কাছে পড়বে না। সে নিশানাথ স্যারের কাছে পড়বে।

'তাঁর কাছে পড়তে চাও কেন?'

'তিনি আমাকে কথা বলা শিখিয়ে দেবেন।'

'উনি তো মা পারবেন না। সবাই সব কিছু পারে না। কথা বলা শেখানোর জন্যে আলাদা স্যার আছেন।'

'আমি তাঁর কাছেই পড়ব। উনি আমাকে কথা বলা শিখিয়ে দেবেন।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।'

আলো শুয়ে পড়ল। কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে চোখ বন্ধ করল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। বাইরে শোঁ শোঁ করে হাওয়া দিচ্ছে। আকাশ মেঘলা ছিল। বৃষ্টি হবে বোধহয়। দীপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।
তাঁর চোখ ভেজা। তাঁর বড়ো কষ্ট হচ্ছে।

৬

ভোর রাত থেকে বৃষ্টি। এমন বৃষ্টি যে সকালে দেখা গেল পোর্চে পানি উঠে গেছে। গাড়ির মাডগার্ড পানির নিচে। গাড়ির ড্রাইভার সুরুজ মিয়া কিছুতেই গাড়ি স্টার্ট দিতে পারল না। আনন্দে তুষারের চোখে পানি এসে গেল। আজও স্কুলে যেতে হবে না। আজ পাটিগণিতের একটা পরীক্ষা হবার কথা। অন্য রকম পরীক্ষা, স্যার একজন-একজন করে বোর্ডে ডাকবেন। বোর্ডে সব ছাত্রদের সামনে অঙ্ক কষতে হবে। যদি কোথাও ভুল হয় তখন স্যার বলবেন—'এই যে বুদ্ধিমান! আমার দিকে তাকাও, চাঁদমুখটা দেখি। মুখ তো সুন্দর মনে হচ্ছে, শুধু কান দু'টি এই সুন্দর মুখের সঙ্গে মানাচ্ছে না। এই যে বুদ্ধিমান, আপনি আসুন আমার সঙ্গে, আপনার কান দু'টি আমি খুলে রেখে দিই।'

স্কুলে যেতে হবে না—এই আনন্দ তুষার চেপে রাখতে চেষ্টা করছে। মনের ভাবটা প্রকাশ হওয়া উচিত নয়। সে মুখ কালো করে বলল, 'সত্যি? স্কুলে যেতে পারব না সুরুজ চাচা?'

সুরুজ মিয়া বলল, 'উঁহু। অবস্থা দেখতেছ না? রাস্তায় এক হাঁটু পানি।'

তুষার দুঃখী-দুঃখী গলা বের করে বলল, 'সারা দিন তাহলে করব কী?'

'কি আর করবা, খেলাধুলা কর। তবে খবরদার পানিতে নামবা না। পানিতে নামলে বেগম সাব খুব রাগ করবেন।'

তুষার কাগজের নৌকা বানাতে বসল। রাত্রি বসল গল্পের বই নিয়ে। তুষারের খুব ইচ্ছা করছিল পানিতে নেমে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করা। একা একা পানিতে যেতে তার সাহসে কুলাচ্ছে না। রাত্রি সঙ্গে থাকলে সে যেত। রাত্রি যাবে না। একবার গল্পের বই নিয়ে বসলে সে বই শেষ না করে ওঠে না। আজ যা মোটা বই হাতে নিয়ে বসেছে ! এটা শেষ হতে-হতে বৃষ্টি থেমে যাবে। পানি নেমে যাবে। এমন চমৎকার একটা ছুটি—অথচ সে তেমন কোনো মজা করতে পারবে না।

তুষার নৌকা বানানোর কাগজ নিয়ে বারান্দায় চলে এল। নৌকা বানিয়ে বানিয়ে বারান্দা থেকেই সে ছাড়বে। সাতটা নৌকা বানাবে। সপ্ত ডিঙ্গা মধুকর। দেখা যাবে নৌকাগুলি কত দূর যায়।

প্রথম নৌকা পানিতে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তুষার লক্ষ করল আলো পানিতে নেমে ছপছপ শব্দ করে বাড়ির পেছনে যাচ্ছে। নিশানাথ স্যারের ঘরের দিকেই যাচ্ছে বোধ হয়।

তুষার ডাকল, 'এই আলো, এই।'

আলো ডাক শুনল না। শুনবার কথাও নয়। সে একা একা কি রকম নির্বিকারভাবে যাচ্ছে। তার হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেছে পানিতে।

তুষার মার কাছে চলে গেল।

দীপার মাথা ধরেছে। তিনি শুয়ে আছেন। তাঁর মাইগ্রেনের ব্যথা আছে। মাঝে মাঝে এই ব্যথা তাঁকে কাবু করে ফেলে। আজও করছে। ঘর অন্ধকার করে তিনি শুয়ে আছেন।

তুষার বলল, 'মা, আলো একা একা বাড়ির পেছনে যাচ্ছে।'

দীপা চুপ করে রইলেন।

'পানি ভেঙে একা একা যাচ্ছে, মা।'

'যাক। তোমরা তাকে খেলায় নেবে না, কিছু করবে না, ও বেচারা একা একা কী করবে ?'

'আমি কি ওকে নিয়ে আসব ?'

'নিয়ে আসতে হবে না। ও কিছুক্ষণ খেলুক একা একা।'

'বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে তো।'

'ভিজুক। খানিকটা ভিজলে কিছু হয় না।'

'আমি খানিকটা ভিজে আসব, মা ?'

'না, তোমাকে ভিজতে হবে না।'

তুষার বেশ মন খারাপ করল। মা'র কাণ্ডটা সে বুঝতে পারছে না। একেক জনের জন্যে একেক ব্যবস্থা কেন ? আলো যদি পানিতে ভিজতে পারে সে পারবে না কেন ? বড়োদের এইসব কোন্ ধরনের যুক্তি ? মাকে যুক্তির ভুল ধরিয়ে দেবার

সাহসও তার হল না। তার শুধু মনে হল, মা নিজে মেয়ে বলেই মেয়েদের বেশি আদর করেন।

নিশানাথ বাবু একটা আয়না হাতে নিয়ে মুখ কালো করে বসে আছেন। তাঁর নিচের পাটির দাঁত পড়তে শুরু করেছে। আজ সকালে দাঁত মাজার সময় দুটো একসঙ্গে পড়ে গেল। আশ্চর্য কাণ্ড ! নিজের মুখটা এখন কী যে কুৎসিত দেখাচ্ছে ! কথাবার্তাও কেমন অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কিছু বললে দাঁতের ফাঁক দিয়ে শব্দ বের হয়ে যাচ্ছে। হচ্ছেটা কী ? নিশানাথ বাবু জানালা দিয়ে তাকালেন। এখনো বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টি একটু কমলে একজন ডেন্টিস্টের কাছে যাবেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবেন। তাঁর ধারণা হল, কোনো একটা ভিটামিনের অভাবে এরকম হচ্ছে। সেই ভিটামিনটা এখন খেলে কি বাকি দাঁতগুলি টিকবে ?

'আমি এসেছি।'

নিশানাথ বাবু চমকে উঠলেন। আলো এসেছে, দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। সে কথা বলছে। মাথার মধ্যে কথা। নিশানাথ বাবু আলোর দিকে ফিরলেন। হাসলেন। যদিও দাঁত-নেই-মুখে হাসতে তাঁর লজ্জা লাগছে। তিনি আলোর সঙ্গে কথা শুরু করলেন। পুরো কথাবার্তা হল মাথার ভেতরে। কারো ঠোঁট নড়ল না। কোনো রকম শব্দ হল না। বাইরের কেউ দেখলে নিশ্চয় ভাবত—এরা দু' জন দু' জনের দিকে তাকিয়ে আছে কেন ? তাদের কথাবার্তার শুরুটা এমন—

নিশানাথ : কেমন আছ ?

আলো : আমি ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন ?

নিশানাথ : আমি ভালো নেই। দেখ না কী কাণ্ড, আমার সব দাঁত আপনা-আপনি পড়ে যাচ্ছে।

আলো : আপনার কি অসুখ করেছে ?

নিশানাথ : বুঝতে পারছি না। হয়তো করেছে। তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন ? এস, বস।

(আলো এসে বসল।)

আলো : আপনি আমার সঙ্গে যেভাবে কথা বলেন অন্যরা সেভাবে বলে না কেন ?

নিশানাথ : পুরো ব্যাপারটা আমি কিছুই জানি না। আমার বোধ হয় কোনো একটা বড়ো অসুখ হয়েছে। সেই অসুখের পর থেকে এই অবস্থা।

আলো : আমি আপনার কাছ থেকে পড়া শিখব।

নিশানাথ : বেশ তো শিখবে। অবশ্যি জানি না পারব কি না। পারতেও পারি।

(নিশানাথ বাবু এই পর্যায়ে খুবই উৎসাহিত বোধ করলেন। তুষারের ইংরেজি শেখানোর ব্যাপারটা তাঁর মনে পড়ল।)

নিশানাথ : আলো, তুমি এক কাজ কর। চোখ বন্ধ করে থাক। আমি তোমার মাথার ভেতর চলে যাব। সেখানে থেকে শেখাব।

আলো : মাথার ভেতর কেমন করে যাবেন ?

নিশানাথ : জানি না। তবে আমি যেতে পারি।

আলো চোখ বন্ধ করে বসল। নিশানাথ বাবু মেয়েটির মাথার ভেতর অনায়াসে চলে গেলেন। তাঁর জন্যে বড়ো ধরনের একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। উজ্জ্বল আলোয় এই মেয়ের মাথার গহীন কুয়ো ঝলমল করছে। নিশানাথ বাবু মুগ্ধ হয়ে গেলেন। গহীন কুয়ো দিয়ে নিচে নামতে নামতে তাঁর বারবার মনে হল, এই মেয়ে একটি অসাধারণ মেয়ে। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারছেন এই মেয়ের কল্পনাশক্তি অসাধারণ, বোঝার ক্ষমতাও অসাধারণ।

নিশানাথ বাবুর রোমাঞ্চ বোধ হল। তাঁর ভালো লাগছে। খুব ভালো লাগছে। আনন্দে মন ভরে যাচ্ছে। তিনি আবার কথা বলা শুরু করলেন।

নিশানাথ : আলো, তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ ?

আলো : পারছি।

নিশানাথ : তুমি কি জান সব কিছুর নাম আছে ?

আলো : জানি।

নিশানাথ : লেখার সময় নামগুলি লিখি। সেই লেখার জন্যে আমরা কিছু চিহ্ন ব্যবহার করি। যেমন অ, আ, ই, ঈ—।

আলো : আমি এইগুলি বইয়ে দেখেছি।

নিশানাথ : এই চিহ্নগুলি সাজিয়ে সাজিয়ে আমরা মনের ভাব লিখে ফেলি। তুমি চিহ্নগুলি শিখে ফেল, তাহলে লিখে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে। বই পড়তে পারবে।

আলো : আমাকে চিহ্নগুলি শিখিয়ে দিন।

নিশানাথ : একদিনে পারব না। ধীরে ধীরে শেখাব।

আলো : আমি একদিনেই সব শিখে ফেলতে চাই।

নিশানাথ : আজ আমি আর শেখাতে পারব না। আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।

নিশানাথ বাবু আলোর মাথার ভেতর থেকে বের হয়ে এলেন। অসহ্য যন্ত্রণা। তিনি ছটফট করতে লাগলেন। এরকম তীব্র যন্ত্রণা তাঁর এর আগে আর হয় নি। শুধু যে যন্ত্রণা হচ্ছে তাই নয়—মুখ থেকে লালা ঝরছে। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। তিনি গোঙানির মতো শব্দ করতে লাগলেন।

দীপা লক্ষ করলেন, আলো ঘরের এক কোণে একটা বই নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে। বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে। তার ভঙ্গি দেখে মনে হয় সে পড়ছে। দীপার মনটাই খারাপ হয়ে গেল। বেচারি আলো পড়া-পড়া খেলা খেলছে। আহা বেচারি ! আহা !

রাত দশটার দিকে দারোয়ান এসে খবর দিল স্যার যেন কেমন করছে।

দীপা ছুটে গেলেন। নিশানাথ বাবু বিছানায় বসে আছেন। তাঁর চোখ রক্তবর্ণ। মুখ দিয়ে লালা ঝরছে।

দীপা বললেন, 'চাচা, আপনার কী হয়েছে?'

নিশানাথ বাবু বললেন, 'কিছু বুঝতে পারছি না, মা। কিছু বুঝতে পারছি না।'

দীপা তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আনতে পাঠালেন। তিনি মনে মনে ঠিক করে রাখলেন ডাক্তার দেখে যাবার পর নিশানাথ বাবুকে হাসপাতালে কিংবা কোনো ক্লিনিকে পাঠিয়ে দেবেন।

'চাচা, আপনার অসুবিধা কী হচ্ছে তা বলুন।'

'আমি নিজেও বুঝতে পারছি না, মা।'

'মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'পানি খাবেন একটু?'

'না। আমার তৃষ্ণা হচ্ছে না।'

'গরম লাগছে কি? ফ্যান ছেড়ে দেব?'

'না। ঠাণ্ডা লাগছে।'

'তাহলে গায়ে একটা চাদর দিয়ে শুয়ে থাকুন। ডাক্তার এক্ষুণি চলে আসবে।'

নিশানাথ বাবু গায়ে চাদর জড়িয়ে শুয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে এল।

ডাক্তার এসে দেখেন রুগী ঘুমুচ্ছে। তিনি বললেন, 'ঘুম ভাঙিয়ে কাজ নেই। আমি সকালে এসে দেখে যাব। ভালো ঘুম হচ্ছে যে কোনো রোগের খুব বড়ো ওষুধ।'

ডাক্তার সাহেবের কথা বোধহয় সত্যি। নিশানাথ বাবুর ঘুম ভাঙল ভোরে। তাঁর মাথাব্যথা নেই। শরীর ঝরঝরে। তিনি অনেকক্ষণ বাগানে হাঁটাহাঁটি করলেন।

চা খেতে খেতে মালির সঙ্গে অনেক গল্প করলেন। সবই তাঁর ছেলেবেলার গল্প। গল্প শেষ করে নিজের ঘরে এসে চিঠি লিখলেন তাপসীকে। তাপসী তাঁর বড়ো বোনের মেয়ে, কোলকাতায় থাকে। বি. এ. পড়ে। এই মেয়েটিকে তিনি ছেলেবেলায় খুব স্নেহ করতেন। দেশ ছেড়ে সে যখন তার মার সঙ্গে চলে যায় তখন তিনি খুব কেঁদেছিলেন।

তাপসী,

মা আমার। ময়না আমার। মা গো, তুমি কেমন আছ? আমার শরীর ভালো নেই মা। কি জানি হয়েছে। বেশি দিন আর বাঁচব না। আমার কি যে হয়েছে

নিজেও জানি না। খুব কষ্ট হয়। মাথার যন্ত্রণা। এই কষ্ট তবু সহ্য করা যায় কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কষ্ট আমি মানুষের মাথার ভেতর ঢুকে যেতে পারি... ।

এই পর্যন্ত লিখে নিশানাথ থামলেন। তাপসী এই চিঠি পড়ে কী ভাববে ? নিশ্চয়ই ভাববে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তিনি আবোলতাবোল ভাবছেন।

নিশানাথ বাবু চিঠি ছিঁড়ে ফেললেন।

৭

মাসুদ মুখ শুকনো করে বসে আছে।

রাগে তার শরীর জ্বলে যাচ্ছে। রাগের কারণ হচ্ছে দরজায় নক না করে ডাক্তার সাহেবের চেম্বারে ঢোকায় ডাক্তার সাহেব খুব বিরক্ত হয়েছেন। অন্য সময় হলে বিরক্ত হতেন না, আজ হয়েছেন। কারণ ঐ মেয়ে ঘরে বসে আছে। মেয়েটা বড়ো যন্ত্রণা করছে। কাজের সময় যদি এভাবে বসে থাকে তাহলে কীভাবে কাজ হয় ? সব কিছুর সময়-অসময় আছে। প্রেম খুবই ভালো জিনিস। তাই বলে কাজের সময় কেন ? রুগীরা বসে আছে, এক্সরে রিপোর্ট নিয়ে যাবে। ডাক্তার সাহেবের সময় হচ্ছে না।

মাসুদ ডাক্তার সাহেবের চেম্বারে ইচ্ছা করেই শব্দ না করে ঢুকেছে, যাতে সে অস্বস্তিকর কোনো পরিস্থিতিতে দু'জনকে দেখতে পায়, মেয়েটা যেন লজ্জায় পড়ে। লজ্জায় পড়লে আসা-যাওয়া কমাবে। আসা-যাওয়াটা যেন একটু কমায়। কোনো কিছুরই বাড়াবাড়ি ভালো নয়। প্রেমের মতো ভালো যে-জিনিস তারও বাড়াবাড়ি খারাপ।

মাসুদ অবশ্যি তাদের কোনো অস্বস্তিকর অবস্থায় দেখল না। দু'জনই মুখোমুখি বসে গল্প করছে। খুব সিরিয়াস ধরনের কোনো গল্প হবে, কারণ দু'জনের মুখই বেশ গম্ভীর।

ডাক্তার সাহেব মাসুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী চাও ?'

'রিপোর্টগুলি কি হয়েছে স্যার ?'

'হ্যাঁ হয়েছে। নিয়ে যাও। শোন মাসুদ—ঘরে ঢুকবার সময় নক করে তারপর ঢুকবে। এটা হচ্ছে সাধারণ ভদ্রতা।'

ডাক্তার সাহেবের কথার জবাবে কিছু না বলে চুপ করে থাকলে ঝামেলা চুকে যেত, মাসুদ তা পারল না। সে বলে ফেলল, 'কাজের সময় এত কিছু মনে থাকে না, স্যার। রুগী বসে আছে। কতক্ষণ বসে থাকবে বলেন ? ওদের তো কাজকর্ম আছে। সারাদিন বসে থাকলে তো তাদের চলে না।'

'রুগী বসে থাকবার সঙ্গে দরজায় নক করার সম্পর্ক কী ? রুগী বসে থাকলে কি দরজা নক করা যায় না ?'

'মনে থাকে না, স্যার।'

'সাধারণ জিনিস মনে থাকে না, বাকি সব তো মনে থাকে। তোমার আচার-ব্যবহার আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

'অপছন্দের কি করলাম, স্যার ?'

'অপছন্দের কী করেছ তুমি জান না ?'

'জ্বি না।'

ডাক্তার সাহেবের মুখ রাগ এবং অপমানে কালো হয়ে গেল। তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'রুগীদের সঙ্গে তুমি খুব খারাপ ব্যবহার কর। তোমার বিরুদ্ধে অনেকেই কমপ্লেইন করেছে।'

এই পর্যায়ে মাসুদ একটা বড়ো ভুল করল, না ভেবেচিন্তে বলে বসল, 'কমপ্লেইন তো স্যার আপনার বিরুদ্ধেও আছে। সব কমপ্লেইন ধরলে কি আর চলে ? কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধেও কমপ্লেইন করে, করে না ?'

ডাক্তার সাহেব থমথমে গলায় বললেন, 'আমার বিরুদ্ধে কী কমপ্লেইন আছে ?'

'বাদ দেন।'

'বাদ দেব কেন ? শুনি কি কমপ্লেইন।'

'আমাকে আপনি 'তুমি' করে বলেন কেন ? ছোট চাকরি করি বলেই তুমি বলতে হবে ? আমি স্যার বি. এসসি পাস একটা ছেলে।'

'ঠিক আছে। তুমি যাও।'

মাসুদ বের হয়ে এল। তার কিছুক্ষণ পরই সে যে চিঠি পেল তার বক্তব্য হচ্ছে—নোভা পলিক্লিনিকে তোমার চাকরির প্রয়োজন নেই। আগামী দিনের ভেতর তুমি তোমার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবে।

এক কথায় চাকরি নট। মাসুদের মনটা খুবই খারাপ হয়েছে। এই সময়ে চাকরি চলে যাওয়া একটা ভয়াবহ ব্যাপার। নতুন চাকরি তার পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব নয়। বদমেজাজের জন্যে এর আগেও দু'বার চাকরি গেছে। এই নিয়ে তৃতীয় বার হল।

ডাক্তার সাহেবের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইলে হবে কিনা কে জানে ! ক্ষমা চাইতে ইচ্ছা করছে না। মাসুদ হেল্পার ছেলেটাকে চা আনতে পাঠাল।

হাত-ভাঙা এক রুগী এসেছে। কিছুক্ষণ পর পর হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠছে।

মাসুদ তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'খবর্দার, নো সাউন্ড। চিৎকার করলে ব্যথা কমে না, উল্টো—হার্টের ক্ষতি হয়।'

হাত-ভাঙা রুগীর সিরিয়াল তেত্রিশ। মাসুদ তাকে ছ' নম্বরে নিয়ে এল। অন্য রুগীরা হৈ-চৈ শুরু করেছে। মাসুদের মুখটাই তেতো হয়ে গেল। ব্যথায় একজন মরে যাচ্ছে—তাকে আগে যেতে দেবে না ! এটা কি রকম বিচার ?

চ্যাংড়া-মতো এক ছোকরা ফুসফুসের এক্সরে করতে এসেছে। সে তেরিয়া হয়ে বলল, 'পেছনের জনকে আগে দিচ্ছেন, ব্যাপার কি ?'

মাসুদ গম্ভীর গলায় বলল, 'আমার ইচ্ছা।'

'আপনার ইচ্ছা মানে ?'

'আমার ইচ্ছা মানে আমার ইচ্ছা। পছন্দ না হলে যান, ডাক্তার সাহেবের কাছে গিয়ে কমপ্লেইন করেন। ঐ যে ডাক্তার ঐ ঘরে বসে। দরজা নক করে তারপর যাবেন ভাই, ভেতরে লেডিজ আছে।'

চ্যাংড়া রাগে কাঁপতে কাঁপতে ডাক্তারের ঘরে ঢুকল। মাসুদ মনে মনে বলল, হারামজাদা।

ঠিক এই সময় ঘরে ঢুকলেন নিশানাথ বাবু। মাসুদ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। সে চিনতে পেরেছে। না পারলেই বোধ হয় ভালো হ'ত। এ কী অবস্থা হয়েছে মানুষটার !

নিশানাথ বাবু মাসুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভালো আছেন ?'

মাসুদ জবাব দিল না। জবাব দেবার মতো অবস্থা তার নেই। সে স্তম্ভিত। তার চোখে পলক পড়ছে না।

নিশানাথ বাবু বললেন, 'আমাকে তো চিনতে পেরেছেন, তাই না ?'

'জ্বি ! আপনার অবস্থা তো ভাই খুব খারাপ।'

'খারাপ। আপনার এখান থেকে যাবার পর কী যে হল ! মাথার সব চুল পড়ে গেল। দাঁতও সব পড়ে যাচ্ছে। তার ওপর মাথায় যন্ত্রণা হয়।'

'বসেন ভাইজান, বসেন। আপনাকে দেখে মনটাই খারাপ হয়ে গেল। খুবই খারাপ। বিশ্বাস করেন, মনটা খুব খারাপ হয়েছে।'

লোকটির মনের অবস্থা নিশানাথ বাবু পরিষ্কার বুঝতে পারছেন। সে খুবই দুঃখিত। তার চোখে পানি এসে যাচ্ছে। একটা মানুষ তার জন্যে এতটা মন খারাপ করে কীভাবে—তা তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। তবে এই মানুষটা তাঁর কাছে কোনো একটা ব্যাপার লুকোতে চেষ্টা করছে। এক্সরে সংক্রান্ত ব্যাপার। তিনি ইচ্ছা করলেই লুকোনো ব্যাপারটা ধরতে পারেন। মাথার আর একটু গভীরে ঢুকলেই হয়। নিশানাথের মনে হচ্ছে এটা ঠিক নয়। অনধিকার চর্চা। একজন মানুষের ব্যক্তিগত জগতে ঢুকে পড়া। এটা অন্যায়। বড়ো ধরনের অন্যায়।

মাসুদ বলল, 'ভাইজান, আপনাকে দেখে আমার মনটা ভেঙে গেছে। আপনি যান, ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন। উনি যদি কোনো ওষুধপত্র দেন।'

নিশানাথ বাবু নিচু গলায় বললেন, 'অসুখটা আবার একদিক দিয়ে ভালো। এখন আমি অনেক কিছু বুঝতে পারি।'

'কী বুঝতে পারেন ?'

'এই যে ধরুন আপনার আজ চাকরি চলে গেছে, এটা আমি জানি।'

মাসুদের চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেল। তার বেশ কিছু সময় লাগল ব্যাপারটা বুঝতে। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'আর কী জানেন ?'

'আর জানি যে আপনি মানুষটা খুবই বদরাগী কিন্তু আপনার মনটা কাঁচের মতো পরিষ্কার। আপনার বড়ো ভাই মারা গেছেন। বড়ো ভাইয়ের পুরো সংসার দীর্ঘদিন ধরে আপনি টানছেন। এই কারণে বিয়েও করেন নি। আরো জানি যে খুবই যারা গরিব রুগী তাদের কাছ থেকে এক্সরের টাকা নিয়ে ভাঙতি ফেরত দেবার সময় ইচ্ছা করে বেশি টাকা ফেরত দেন।'

মাসুদ স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই লোক এসব কথা কীভাবে বলছে ? সে ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আপনি একটু ডাক্তার সাহেবের কাছে যান। তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। আপনাকে এতক্ষণ আমি বলি নি, কিন্তু না বলে পারছি না।—আমাদের এখানে এক্সরে মেশিনে একটা গণ্ডগোল হয়েছিল, তার থেকে আপনার এইসব হচ্ছে। আপনি যান, ডাক্তার সাহেবের কাছে যান। এই লোকটা খুব খারাপ, তবে ডাক্তার ভালো। সব খারাপ মানুষেরই দু'-একটা ভালো ব্যাপার থাকে।'

নিশানাথ বাবু ডাক্তার সাহেবের কামরায় ঢুকলেন। ডাক্তার সাহেব বিরক্তমুখে তাকালেন। শীতল গলায় বললেন, 'কি ব্যাপার। কী চান আপনি ?'

নিশানাথ বাবু জবাব দিলেন না। তিনি নিমেষের মধ্যে ঢুকে গেলেন ডাক্তার সাহেবের মাথার ভেতরে। তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। তিনি শিউরে উঠলেন। এই ডাক্তারের মনে এত ঘৃণা কেন ? এত লোভ কেন ? মানুষটার চেহারা কী সুন্দর ! কত জ্ঞান, কত পড়াশোনা অথচ তার মন ঘৃণায় নীল হয়ে আছে ! ঘৃণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তীব্র লোভ। সব কিছুর জন্যেই লোভ। এই মুহূর্তে তার লোভ সামনে বসে থাকা স্নিগ্ধ চেহারার মেয়েটির প্রতি। কত বয়স মেয়েটির ? খুব বেশি হলে সতেরো-আঠারো।

নিশানাথ বাবু ডাক্তার সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেমন আছেন ?'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আমি কেমন আছি সেই তথ্যের আপনার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আপনি আমার কাছে কী চান সেটা বলুন।'

'কিছুই চাই না।'

'কিছুই চান না, তাহলে এসেছেন কেন ?'

নিশানাথ বাবু মেয়েটির দিকে তাকালেন। এই তো সেই মেয়ে যাকে এতবার স্বপ্নে দেখেছেন। নাসিমা নাম। নিশানাথ বাবু বললেন, 'কেমন আছ, মা ?'

মেয়েটি চমকে উঠে বলল, 'আমাকে বলছেন ?'

'হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি। ঐদিন তুমিই তো এখানে ছিলে। ঐ যে তোমার জন্মদিন ছিল। অথচ তোমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। তুমি একটা ট্রাকের সামনে দৌড়ে চলে গেলে। যদি ট্রাকটা না থামত ?'

ডাক্তার সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, 'পাগল না-কি এই লোক ? হু আর ইউ ? গেট আউট, গেট আউট।'

নাসিমা কাঁপা গলায় বলল, 'না, উনি পাগল নন। উনি ঠিকই বলছেন। খুব ঠিক বলছেন।'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আপনি কে ?'

'আমি আপনার একজন রুগী।'

'আমার রুগী মানে ? রুগীদের সঙ্গে আমার কোনো ব্যাপার নেই। আমি রেডিওলজিস্ট। এক্সরে প্লেট দেখে রিপোর্ট লিখে দিই। সোজাসুজি বলুন তো—আপনি কে ?'

'আমার মাথার ভেতর দিয়ে প্রচুর এক্সরে চলে গিয়েছিল। মনে নেই আপনার ? তারপর থেকে দেখুন না কী হয়েছে। মাথার চুল পড়ে গেছে। দাঁত পড়ে গেছে। হাতের নখগুলিও মরে যাচ্ছে। এই দেখুন না কেমন কালচে হয়ে গেছে।'

'আপনি সেই রুগী ?'

'জ্বি, আমিই সেই।'

ডাক্তার সাহেব নিজের বিস্ময় গোপন করে ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'কি উল্টোপাল্টা কথা বলছেন ? আমাদের এখানে কারো মাথার ভেতর দিয়ে বেশি এক্সরে পাস করানো হয় না। যতটুকু দরকার ততটুকুই করা হয়। আজেবাজে এলিগেশন এনে আপনার লাভ হবে না।'

'আপনার ভয় নেই। আমি কোনো অভিযোগ করছি না।'

নিশানাথ বাবু বুঝতে পারছেন ডাক্তার তাঁর কথা কিছুই বিশ্বাস করছে না। সে অবিশ্বাসী চোখে তাকিয়ে আছে। এই লোকটির মন অবিশ্বাস এবং সন্দেহে পরিপূর্ণ। আচ্ছা, কিছু কি করা যায় না ?

এর মাথায় ঢুকে সামান্য কিছু ওলটপালট কি করে দেয়া যায় না ? তিনি যদি তুষারের মাথায় ঢুকে কিছু পরিবর্তন করতে পারেন, তিনি যদি আলোর মতো একটি মূক ও বধির মেয়েকে শেখাতে পারেন, তাহলে এই লোকটিকে কেন পারবেন না ? চেষ্টা করতে তো ক্ষতি নেই। চেষ্টা করে দেখাই যাক না।

ডাক্তারের মাথার ভেতর ঢুকে নিশানাথ বাবু প্রায় দিশা হারিয়ে ফেললেন। কী অসম্ভব জটিলতা ! মস্তিষ্কের কুয়োর ভেতর যত নামছেন জটিলতা ততই বাড়ছে। কুয়োর গহীন তলদেশের দিকে তিনি প্রবল টান অনুভব করছেন। যতই নিচে নামছেন আকর্ষণ ততই বাড়ছে। লোকটির চিন্তা-ভাবনার শিকড় অনেক দূর পর্যন্ত গেছে। ততটা নামাও কষ্ট। বেশ কষ্ট।

একজনের মাথার ভেতর প্রবেশ করবার সঙ্গে সব পরিষ্কার বোঝা যায়। একজন মানুষের মানসিকতা কেমন ? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটের বিশাল বিশাল ইমারত। সেইসব ইমারতে বিচিত্র সব প্যাটার্ন। অদ্ভুত সব নকশা। একজন মানুষের

মানসিকতা বদলানোর মানে হচ্ছে ঐসব নকশায় পরিবর্তন নিয়ে আসা। যার জন্য পুরো ইমারতই ভেঙে নতুন করে বানানো দরকার হয়ে পড়ে। নিশানাথ বাবু তা পারলেন। তবে তাঁর অসম্ভব কষ্ট হতে লাগল। মনে হল যেন শরীর অবশ হয়ে আসছে। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছেন। এর মধ্যেও কিছু কিছু পরিবর্তনের চেষ্টা করলেন। কাজটা কঠিন, তবে পুরোপুরি অসম্ভব নয়। তার কারণ মানসিকতা পরিবর্তনের ব্যাপারটা কীভাবে করতে হয় তা তিনি জানেন। কেউ তাঁকে শিখিয়ে দেয় নি। তবু তিনি জানেন। কী করে জানেন সেও এক রহস্য।

এক সময় কাজ শেষ হল। নিশানাথ বাবু উঠে দাঁড়ালেন। ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'যাই, ডাক্তার সাহেব। আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। সম্ভবত বাঁচব না।'

ডাক্তার সাহেব চুপ করে রইলেন। মুখে কিছু বললেন না, তবে নিশানাথ বাবু পরিষ্কার বুঝতে পারলেন ডাক্তার লজ্জিত বোধ করছেন, কারণ নিশানাথ বাবুর এই সমস্যার মূলে তাঁর এক্সরে মেশিন। এবং তিনি ভালো করেই জানেন রেডিয়েশন সিকনেসের সব লক্ষণ নিশানাথ বাবুর মধ্যে প্রকট হয়েছে। তাঁর আয়ু শেষ হয়ে আসছে। কুড়ি মিলিরেমের বেশি রেডিয়েশন একজনের শরীরের ভেতর দিয়ে চালানো যায় না অথচ এই লোকটির মাথার ভেতর দিয়ে খুব কম করে হলেও দশ হাজার রেম রেডিয়েশন গিয়েছে। হয়তো এই লোকটির থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ইতিমধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে। মস্তিষ্কের নিওরোনের বড়ো ধরনের কোনো পরিবর্তনও নিশ্চয়ই হয়েছে।

ডাক্তার সাহেব কেমন যেন লজ্জিত বোধ করতে লাগলেন। তাঁর মনে হতে লাগল, এই মানুষটির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। লোকটির প্রতি তাঁর খানিকটা মায়াও হতে লাগল। কেন এরকম হচ্ছে তাও বুঝতে পারলেন না।

তিনি বললেন, 'আমরা খুবই লজ্জিত। মানে যন্ত্রটা হঠাৎ ম্যালফাংশান করল।. কোনো কারণ ছিল না। হঠাৎ সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেল।'

নিশানাথ বাবু হেসে বললেন, 'আমার জন্যে ভালোই হয়েছে। বয়স হয়েছে, এমনিতেই তো মরে যেতাম। অদ্ভুত কিছু জিনিস জেনে গেলাম।'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'কী জানলেন আমাকে কি ভালো করে গুছিয়ে বলবেন? টেলিপ্যাথিক কিছু ক্ষমতা আপনার ডেভেলপ করেছে তা বুঝতে পারছি।'

'ক্ষমতাটা কী ধরনের এটা জানা দরকার।'

'অন্য একদিন জানবেন। আজ যাই। শরীরটা এত খারাপ লাগছে, বলার না।'

নিশানাথ বাবু ঘর থেকে বেরুবার আগে কয়েক মুহূর্তের জন্যে নাসিমা মেয়েটির মাথার ভেতরেও গেলেন। অতি অল্প সময় কাটালেন সেখানে। সামান্য কিছু পরিবর্তন করলেন। বড়ো কিছু করার সময় তাঁর নেই। কষ্ট হচ্ছে, বড়োই কষ্ট হচ্ছে।

মেয়েটি একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। সে কিছুই বুঝতে পারছে না। বুঝতে চেষ্টাও করছে না। এই কুৎসিত লোকটি তার সব খবর জানে—এটা কী

করে সম্ভব তা সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না। সে ভীষণ ভয় পেয়েছে। ব্যাখ্যার অতীত কোনো কিছুর সামনে দাঁড়ালে আমরা যেমন ভয়ে কুঁকড়ে যাই এও সে-রকম।

নিশানাথ বাবু ঘর থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে নাসিমা উঠে চলে গেল। ডাক্তারের দিকে তাকাল পর্যন্ত না। অন্ধ ভয় তাকে গ্রাস করে ফেলছে। সে দ্রুত বাসায় চলে যেতে চায়। বিবাহিত বয়স্ক এই মানুষটিকে তার ভালো লাগে। ভালো লাগে বললে কম বলা হবে। ভালো লাগার চেয়েও বেশি। সে জানে, গোপনে এখানে আসা অন্যায়। খুবই অন্যায়। তবু সে নিজেকে সামলাতে পারে না। আজ এই বুড়ো লোকটির কথা তাকে বড়ো ধরনের ধাক্কা দিয়েছে। শুধু কি কথা ? এই বুড়ো লোকটি কি কথার বাইরেও কিছু করে নি ? তার তো মনে হচ্ছে, করেছে। কীভাবে করেছে কে জানে ? আচ্ছা এই মানুষটা কি কোনো দরবেশ ? কোনো বড়ো ধরনের পির ফকির ?

নাসিমা চলে যাবার পর ডাক্তার সাহেব খানিকক্ষণ একা একা বসে রইলেন। তারপর পরপর দুটো সিগারেট খেয়ে মাসুদকে ডাকলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, 'বস।'

মাসুদ আশ্চর্য হয়ে তাকাল। ডাক্তার সাহেবের গলা অন্য রকম লাগছে। গলার স্বরে মমতা মাখানো।

'বসতে বললাম তো, বস।'

মাসুদ বসল। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'তুমি বয়সে আমার অনেক ছোট, এই জন্যে তুমি বলি। কিছু মনে কর না।'

'জ্বি না, কিছু মনে করি নি।'

'তোমাকে বরখাস্ত করার যে চিঠিটা দিয়েছিলাম ওটা ফেলে দাও।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'রাগের মাথায় আমরা অনেক সময় এটা-ওটা বলি বা করি। এটা মনে রাখা ঠিক নয়।'

'জ্বি স্যার।'

'তুমি যেমন ভুল কর, আমিও করি। হয়তো তোমার চেয়ে বেশিই করি। যেমন এই যে নাসিমা মেয়েটাকে প্রশ্রয় দেওয়া—বিরাট অন্যায়।'

'বাদ দেন স্যার।'

'ভালো একটা মেয়ে অথচ প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে...'

'শুধু আপনার তো দোষ না স্যার। মেয়েটারও দোষ আছে—ও আসে কেন ?'

'না-না, মেয়েটার কোনো দোষ নেই। বাচ্চা মেয়ে। এদের আবেগ থাকে বেশি। আবেগের বশে...'

মাসুদ বলল 'স্যার, উঠি ? সাত-আটজন রুগী এখনো আছে।'

'তুমি আরেকটু বস। তোমার সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা আছে।'

মাসুদ কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছে। অনেকক্ষণ ইতস্তত করে ডাক্তার সাহেব বললেন, 'তুমি কতদিন ধরে আমাকে চেন ?'

'প্রায় সাত বছর।'

'এই সাত বছরে তুমি নিশ্চয় আমার আচার-আচরণ আমার মানসিকতা খুব ভালো করেই জান। জান না ?'

'জানি, স্যার।'

'আমার আজকের ব্যবহার কি তোমার কাছে সম্পূর্ণ অন্য রকম মনে হচ্ছে না ?'

'হচ্ছে।'

'এর কারণটা কি ?'

মাসুদ তাকিয়ে রইল। কিছু বলল না। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আমার কি মনে হচ্ছে জান ? আমার মনে হচ্ছে ঐ বুড়ো লোকটি আমাকে কিছু একটা করেছে।'

'হিপনোটাইজ ?'

'হিপনোটাইজের চেয়েও বেশি। আমার ধারণা, খুব উঁচু মাত্রার ট্যালিপ্যাথিক ক্ষমতা সে ব্যবহার করেছে। নিতান্তই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তবে আমার এ রকম মনে হচ্ছে। আচ্ছা, এই লোকটির মাথার ভেতর দিয়ে কী পরিমাণ রেডিয়েশন গিয়েছে ?'

'আমি তো স্যার বলতে পারব না। টেকনিশিয়ান বলতে পারবে। জেনে আসব ?'

'যাও, জেনে আস।'

ডাক্তার সাহেব আবার একটি সিগারেট ধরালেন। তিনি সিগারেট ছাড়ার চেষ্টা করছেন, অথচ আজ এই অল্প সময়ের ভেতর তিনটে সিগারেট ধরিয়ে ফেললেন। মনে মনে ঠিক করে ফেললেন কাল-পরশুর মধ্যে একবার মেডিক্যাল কলেজ লাইব্রেরিতে যাবেন। মস্তিষ্কের উপর রেডিয়েশনের প্রভাব—এই জাতীয় কোনো বই পান কি-না তা খোঁজ করবেন। এর উপর কোনো কাজ কি হয়েছে ? নিউরো-সার্জনরা বলতে পারবেন। এটা তাঁদের এলাকা। হিটলারের সময় কন্সেনট্রেশন ক্যাম্পের কিছু বন্দিকে নিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। ঠিক এক্সরে না হলেও মোটামুটি ধরনের শক্তিশালী ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ দীর্ঘ সময় ধরে মাথার ভেতর দিয়ে চালানো হয়েছিল। এই পরীক্ষার ফলাফল কখনো প্রকাশ করা হয় নি। অথচ জোর করে বন্দিদের ওপর অন্য যে-সব পরীক্ষা চালানো হয়েছে তার সব ফলাফলই সযত্নে রাখা আছে। মস্তিষ্কের উপর রেডিয়েশনের প্রভাবের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হল না কেন ? রহস্যটা কোথায় ?

ডাক্তারের কাছ থেকে বের হয়ে নিশানাথ বাবু একটা রিকশা নিলেন। রিকশায় ওঠার পরপরই তাঁর মনে পড়ল যে-কারণে ডাক্তারের কাছে এসেছিলেন সেটাই পুরোপুরি ভুলে গেছেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অতি দ্রুত নষ্ট হচ্ছে। এর কারণ কি ?

এই ডাক্তারের কাছে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য হল দাঁতের মাঢ়ির এক্সরে কপি তোলা। নিশানাথ একজন ডেন্টিস্টের কাছে গিয়েছিলেন। সব দাঁত কেন হঠাৎ করে পড়ে যাচ্ছে এটাই দেখতে চান। ডেন্টিস্ট ব্যাপার দেখে হকচকিয়ে গেল। নিশানাথকে বলল একটা এক্সরে করাতে। যদি তাতে কিছু ধরা পড়ে। সেই উদ্দেশ্যেই এবারে তিনি পলিক্লিনিকে এসেছিলেন, অথচ আসল কথাটিই ভুলে গেলেন !

রিকশা দ্রুত যাচ্ছে। এই রিকশাওয়ালা বেশ বলশালী। সে ঝড়ের বেগে রিকশা নিয়ে যাচ্ছে। নিশানাথ বললেন, 'আস্তে চলুন ভাই।'

রিকশাওয়ালা বলল, 'টাইট হইয়া বহেন। চিন্তার কিছু নাই।'

তিনি রিকশাওয়ালার মনে কী হচ্ছে পরিষ্কার বুঝতে পারছেন। সে খুব ফুর্তিতে আছে। আনন্দে আছে। তার আনন্দের কারণটি স্পষ্ট। আজ দেশ থেকে তার স্ত্রী এসেছে। অনেকদিন সে খোঁজখবর নিচ্ছিল না। ভয় পেয়ে তার স্ত্রী (যার নাম মনু) একা একা ঢাকা শহরে চলে এসেছে এবং ঠিকানা ধরে ঠিকই তাকে খুঁজে বের করে ফেলেছে। রিকশাওয়ালা মুখে খুবই রাগ করেছে। মনুর একা-একা চলে আসাটা যে কী রকম বোকামি এবং ঢাকা শহরটা যে কী পরিমাণ খারাপ তা সে তার স্ত্রীকে বলেছে। তবে মনে মনে সে দারুণ খুশি হয়েছে। এই মুহূর্তে সে ভাবছে ঢাকা শহর পুরোটা সে তার স্ত্রীকে দেখাবে। রিকশায় বসিয়ে বিকাল থেকেই ঘুরবে। হাতে সময় নেই। জমার টাকা তুলে ফেলতে হবে।

নিশানাথ রিকশা থেকে নামবার পর ভাড়ার সঙ্গে আরো ত্রিশ টাকা দিলেন বখশিশ।

রিকশাওয়ালা অবাক হয়ে তাকাল। তিনি বললেন, 'মিরপুরের চিড়িয়াখানাটা তোমার স্ত্রীকে দেখিও। খুশি হবে। এখন স্ত্রীর কাছে চলে যাও। জমার টাকা নিশ্চয়ই উঠে গেছে। তাই না ? এই টাকাটা হল বাড়তি।'

রিকশাওয়ালা ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আপনে লোকটা কে ?'

নিশানাথ নিচু গলায় বললেন, 'কেউ না, আমি কেউ না।'

রিকশাওয়ালার বিস্ময় আরো গাঢ় হল। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে অতীন্দ্রিয় কোনো রহস্য চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছে।

৮

দীপা দু' দিন ধরে ব্যাপারটা লক্ষ করছেন। বই নিয়ে ঘরের এক কোণে আলো বসে থাকে। পাতা ওল্টায়। এমন নিবিষ্ট তার ভাবভঙ্গি যে মনে হয় সে সত্যি সত্যি পড়তে পারছে। দীপা জানেন এটা এক ধরনের খেলা। মেয়েটা একা একা এই অদ্ভুত খেলা খেলে—তাঁর কষ্ট হয়। কিন্তু করার কী আছে ?

এই মেয়েটির মধ্যে বড়ো কোনো পরিবর্তন এসেছে। রাতে এখন আর মোটেই বিরক্ত করে না। একা একা ঘুমুতে চায়। মাকে বলে বাবার ঘরে গিয়ে ঘুমুতে। বলার সঙ্গে মাথাটা এমন ভাবে নিচু করে ফেলে যাতে মনে হয় বাবা-মা'র একসঙ্গে ঘুমনোর রহস্যের অজানা অংশটি এখন সে জানে।

দীপা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে রান্নাঘরের দিকে রওনা হলেন। দারোয়ান এসে খবর দিল—নিশানাথ বাবুর অবস্থা বেশি ভালো নয়, একটু পরপর বমি করছেন।

'ডাক্তারকে খবর দেয়া হয়েছে না?'

'জ্বি।'

'খোঁজ নাও এখনো আসছে না কেন।'

দারোয়ান মুখ নিচু করে বলল, 'মাস্টার সাব বাঁচতো না, আম্মা।'

দীপা বলেন, 'কী ভাবে বুঝলে মারা যাচ্ছে?'

'বোঝা যায় আম্মা, শইলে পানি আসছে। পিঠে চাকা চাকা কী যেন হইছে। মাথারও ঠিক নাই আম্মা।'

'মাথার ঠিক থাকবে না কেন?'

'বিড়বিড় কইরা সারাদিন কী যেন কয়। নিজের মনে হাসে।'

দীপার বেশ মন খারাপ হল। তিনি হাতের কাজ ফেলে নিশানাথ বাবুকে দেখতে গেলেন। দূর থেকে দেখলেন নিশানাথ বাবু ঘরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। তাঁর পাশে আলো। দূর থেকে মনে হচ্ছে তিনি আলোর সঙ্গে কথা বলছেন। এই দৃশ্যটিও অদ্ভুত। আলো অধিকাংশ সময় নিশানাথ বাবুর আশেপাশে থাকে। কেন থাকে কে জানে?

দীপা বারান্দায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই আলো চলে গেল। দীপা বললেন, 'চাচা, কেমন আছেন?'

নিশানাথ বললেন, 'বেশি ভালো না, মা। তুমি একটু বস আমার সামনে। তোমার সঙ্গে আমার খুব জরুরি কথা আছে।'

দীপা বসলেন। কোমল গলায় বললেন, 'বলুন কী কথা।'

'শুনতে তোমার কেমন লাগবে জানি না। আমার এখন কিছু অদ্ভুত ক্ষমতা হয়েছে। আমি মানুষের মনের কথা বুঝতে পারি। ইচ্ছা করলেই মানুষের মাথার ভেতরও ঢুকে যেতে পারি।'

দীপা মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। দারোয়ান মিথ্যা কথা বলে নি—মাথা খারাপেরই লক্ষণ।

'দীপা!'

'জ্বি।'

'শুধু যে মানুষের কথা বুঝতে পারি তাই না—পশুপাখি, জীবজন্তু সবার মনেই কী হচ্ছে বুঝতে পারি।'

'ও আচ্ছা।'

'নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তু মানুষের মতো গুছিয়ে কিছু ভাবে না। ওদের চিন্তাভাবনার সবটাই খাদ্য নিয়ে। অবশ্যি এদের মধ্যে অদ্ভুত কিছু ব্যাপারও আছে। এরা কী মনে করে জান? প্রত্যেকেই ভাবে তারাই জীবজগতের প্রধান। পৃথিবী সৃষ্টিই করা হয়েছে তাদের জন্যে, তাদের সুখ সুবিধার জন্যে।'

দীপা মৃদু গলায় বললেন, 'আমরা মানুষরাও তো তাই মনে করি। করি না?'

'হ্যাঁ করি। কারণ মানুষও তো জন্তুই। জন্তু ছাড়া সে আর কী?'

'হ্যাঁ, তাও ঠিক।'

'নিম্নশ্রেণীর পশুপাখিরা মানুষদের কী ভাবে, জান? তারা মানুষদের খুবই বোকা এক শ্রেণীর প্রাণী বলে মনে করে। ওরা আমাদের বোকামি নিয়ে সব সময় হাসাহাসি করে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ তাই। ঘরের কোনায় জাল বানিয়ে যে-মাকড়সা বসে থাকে সেও মানুষের চরম মূর্খতা দেখে খিকখিক করে হাসে।'

দীপা কিছু বললেন না। খুব সাবধানে ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেললেন। নিশানাথ বললেন, 'তুমি বোধ হয় আমার কথা বিশ্বাস করলে না?'

দীপা হ্যাঁ-না কিছু বললেন না। দুঃখিত চোখে তাকিয়ে রইলেন।

নিশানাথ বললেন, 'তোমার মনের ভেতর কী হচ্ছে আমি বলে দিই? তাহলে তুমি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবে।'

দীপা বলল, 'বলুন।'

'মাথার ভেতর ঢুকতে ইচ্ছা করে না। কেন করে না জান? করে না, কারণ এটা অন্যায়। এটা ঠিক নয়। কিছু না জানিয়ে হুট করে একটা মানুষের ঘরে ঢুকে পড়ার মতো। তাই না, মা?'

দীপা পুরোপুরি নিশ্চিত হল মানুষটির মস্তিষ্কবিকৃতির কিছু বাকি নেই। বেচারার সমস্ত শরীর কী কুৎসিত ভাবেই না ফুলে উঠেছে! দেরি না করে তাকে কোনো বড়ো হাসপাতালে কিংবা ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে দেয়া উচিত।

'দীপা!'

'জ্বি।'

'আমার এই ক্ষমতা মানুষের কাজে লাগানো যায়। কীভাবে যায়, জান?'

'কীভাবে?'

'মানুষের ভেতর মন্দ যে-সব ব্যাপার আছে সেগুলি দূর করার জন্যে আমি কাজ করতে পারি।'

'মানুষ তো একজন দু' জন নয়—লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ।'

'তাও ঠিক। তবে সব মন্দ মানুষকে ভালো বানানোর দরকার তো নেই। এমন সব মানুষদের ভালো করতে হবে যাদের উপর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্য নির্ভর করে। যেমন ধর রাষ্ট্রপ্রধান, দেশের বড়ো বড়ো নেতা।'

'আপনি ঘুমান, চাচা। আমার মনে হয় আপনার ঘুম দরকার।'

নিশানাথ বাবু দীপাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বলে চললেন—'যত দিন যাচ্ছে ততই অদ্ভুত সব জিনিস আমি জানতে পারছি। আমাদের এই মস্তিষ্ক অদ্ভুত একটা জিনিস। সব রকম স্মৃতি এর মধ্যে আছে। মানুষ যখন এ্যামিবা ছিল সেই স্মৃতিও আছে। যদি প্রাণ দীর্ঘকাল কাটাল পানিতে, সেই পানির জগতের স্মৃতিও আছে মানুষের মাথায়। এক সময় এ্যামিবার বিকাশ হল সরীসৃপ হিসেবে। হিংস্র সরীসৃপ, মানুষের আদি পিতা। সেই সরীসৃপের স্মৃতিও সঞ্চিত রইল, মস্তিষ্ক কিছুই হারায় না...।'

'চাচা, আপনি ঘুমুবার চেষ্টা করুন।'

'আমি তো বেশিদিন বাঁচব না। যা আমি জেনেছি সব তোমাকে বলে যেতে চাই। বুঝলে দীপা, আমাদের মাথায় আছে লক্ষ লক্ষ বছরের স্মৃতি। আমাদের মস্তিষ্কের একটা অংশ সরীসৃপের মতো চিন্তা করে, একটা অংশ জলজ জীবের মতো চিন্তা করে, একটা অংশ...'

'চাচা, আপনি ঘুমুতে চেষ্টা করেন...প্লিজ চাচা...'

'আচ্ছা মা, আচ্ছা। তুমি যা বলবে তাই হবে। তুমি যা বলবে তাই হবে। তুমি যা বলবে তাই হবে। তুমি যা...'

নিশানাথ বাবু থামলেন। তীব্র ভয় তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয় তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তিনি যা বলছেন সবই ভুল। সবই ভুল। উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা। কিন্তু কল্পনা বলে তো মনে হয় না।

না না না—কল্পনা নয়—সত্যি। যা ঘটছে সবই সত্যি। একটু পরপর মাথায় বিচিত্র সব কিছু আসছে। অদ্ভুত সব ছবি। তিনি বুঝতে পারছেন ছবিগুলি কল্পনা নয়, স্বপ্ন নয়, বিভ্রম নয়—সবই স্মৃতি। অতি প্রাচীন স্মৃতি। হাজার বছর, লক্ষ বছর কিংবা আরো আগের কোনো স্মৃতি। কোনো কিছুই হারায় না—জীবজগৎ তার মস্তিষ্কে সমস্ত স্মৃতি ধরে রাখে।

কখন প্রাণের বিকাশ হয়েছিল ? তিনি জানেন না। তাঁর পড়াশোনা সীমিত, জ্ঞান সীমিত, বুদ্ধি সীমিত, কিন্তু এখন তিনি অনেক কিছু বুঝতে পারছেন। কেউ যেন তাঁকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। এক সময় এই জগৎ ছিল প্রাণহীন। প্রাণহীন জগতে প্রাণের আবির্ভাব হল। একটি যৌগিক অণু—প্রোটিন। সামান্য ক্ষুদ্র একটি এমিনো এসিড, অথচ কী বিপুল তার সম্ভাবনা ! একটি স্মৃতিধর অণু। কী রহস্য, কী অপার রহস্য !

নিশানাথ বাবু ছটফট করতে লাগলেন। সহ্য হচ্ছে না, তাঁর আর সহ্য হচ্ছে না। তিনি ঘুমুতে চান। ঘুম—শান্তির ঘুম। যেন কত কাল তাঁর ঘুম হয় নি। কত অনন্ত কাল ধরে তিনি জেগে আছেন। তিনি ব্যাকুল স্বরে বললেন, 'দীপা মা, আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও।'

ডাক্তার এসে পড়েছেন।

দীপা ভয়-পাওয়া গলায় বললেন, 'দেখুন তো ডাক্তার সাহেব, অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করছেন।'

ডাক্তার রুগীর কপালে হাত রেখে চমকে উঠলেন—জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। শরীরের এই অস্বাভাবিক উত্তাপ দ্রুত কমানো প্রয়োজন। বরফজলে গা ডুবিয়ে রাখতে হবে—এছাড়া অন্য কিছু তিনি এই মুহূর্তে ভাবতে পারছেন না।

নিশানাথ চোখ মেললেন, ঘোলাটে চোখ। মনে হচ্ছে চারপাশের জগৎ তিনি চিনতে পারছেন না। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'কেমন লাগছে?'

নিশানাথ ফিসফিস করে বললেন, 'ভালো লাগছে না, খুব খারাপ লাগছে, মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে।'

'খুব বেশি যন্ত্রণা।'

'হ্যাঁ, খুব বেশি। মাঝে মাঝে আবার চোখে দেখতে পাই না। সব ঝাপসা লাগে।'

ডাক্তার সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'চোখে দেখতে পান না?'

'জ্বি-না। সব সময় না। মাঝে মাঝে এরকম হয়।'

'এখন কি দেখতে পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, পাচ্ছি। ডাক্তার সাহেব, খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। দয়া করে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিন।'

ডাক্তার সাহেব একটা পেথিড্রিন ইনজেকশন দিলেন। প্রচুর বরফের ব্যবস্থা করতে বললেন। রুগীকে বরফ-পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে। এমন 'হাই ফিভার' তিনি তাঁর ডাক্তারি জীবনে কখনো দেখেন নি। অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

বরফ চলে এল। ডাক্তার সাহেবকে সেই বরফ ব্যবহার করতে হল না। তার আগেই রুগীর জ্বর কমে গেল। এটাও একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'রুগীকে এখানে রাখা ঠিক হবে না। হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিন।'

দীপা বললেন, 'ওঁর কী হয়েছে?'

'আমি ধরতে পারছি না। হাসপাতালে বড়ো বড়ো ডাক্তার আছেন। তাঁরা হয়তো বুঝতে পারবেন।'

দীপা কী করবেন বুঝতে পারলেন না। নিশানাথ বাবুকে হাসপাতালে পাঠাতে তাঁর মন সরছে না। হাসপাতালে তাঁকে কে দেখবে ? শরীরের এই অবস্থায় যতটুকু সেবা-যত্ন দরকার হাসপাতাল তার কতটা করবে ? তাঁর পক্ষে বেশি সময় দেয়া সম্ভব নয়, তাছাড়া তিনি হাসপাতাল সহ্য করতে পারেন না। হাসপাতালে পা দিলেই বমি-বমি ভাব হয়। বাসায় ফিরেও তা কাটতে চায় না। মহসিনের সঙ্গে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করা দরকার। তাকে ইদানীং পাওয়াই যাচ্ছে না। কী নিয়ে যেন খুব ব্যস্ত। মাঝে মাঝে এমনও হয়—বাড়ি ফিরতে পারে না। কোনো একটা সমস্যা নিশ্চয়ই হয়েছে। মহসিনের চিন্তিত মুখ দেখেই তা বোঝা যায়। ব্যবসাসংক্রান্ত কোনো জটিলতা হবে। দীপা প্রায়ই ভাবেন জিজ্ঞেস করবেন—জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠে না। মহসিনের ব্যবসার ব্যাপারে কোনো কৌতূহল দেখাতে তাঁর ভালো লাগে না।

আজ মহসিন সাহেব সন্ধ্যার আগেই ফিরলেন। তাঁর মুখ শুকনো—তাঁকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে। দীপা চায়ের কাপ নিয়ে যেতেই বললেন, 'আজ আমাকে সকাল সকাল ভাত দিতে পারবে ?'

দীপা বললেন, 'কেন পারব না। ক'টার সময় ভাত চাও ?'

'এই ধর—সাতটা সাড়ে-সাতটা।'

'কোথাও যাবে ?'

'হুঁ।'

দীপা পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। অথচ মহসিন তাঁকে ঠিক লক্ষ করছেন বলে মনে হচ্ছে না। কেমন যেন অন্যমনস্ক।

'দীপা।'

'বল।'

'আমি আজ বাসায় নাও ফিরতে পারি। যদি দেখ এগারোটার মধ্যে ফিরছি না, তাহলে দারোয়ানকে গেট বন্ধ করে দিতে বলবে।'

'আচ্ছা।'

মহসিন চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে হালকা গলায় বললেন, 'তোমার ডাক্তার বোন এ-বাড়িতে অনেকদিন আসে না। ব্যাপার কি বল তো ?

'ব্যাপার আবার কি ? নিশ্চয়ই কাজ নিয়ে ব্যস্ত।'

'কোনো কিছু নিয়ে রাগটাগ করে নি তো ?'

দীপা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'রাগ করবে কেন ? তৃণা রাগ করার মতো মেয়ে না। তার মধ্যে এই সব ক্ষুদ্রতা নেই। হঠাৎ তৃণার কথা উঠল কেন ?'

'এম্নি। অনেকদিন ওকে দেখি না।'

'আচ্ছা, ওকে আসতে বলব। নিশানাথ চাচার শরীরের অবস্থা নিয়েও ওর সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'ওঁর শরীর কি আবার খারাপ হয়েছে ?'

'হুঁ। আজ তো খুব ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তার সাহেব বললেন, হাসপাতালে নিয়ে যেতে—'

'ডাক্তার বললে তাই কর। তবে এই সব করে কিছু হবে বলে মনে হয় না। তাঁর যা হয়েছে তার নাম মৃত্যু-রোগ। ভালো হবে আবার খারাপ হবে আবার একটু ভালো হবে, চলতেই থাকবে—আনটিল দ্য ফাইনাল সল্যুশন...'

দীপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। কেউ এত সহজ ভঙ্গিতে মৃত্যুর কথা বললে তাঁর ভালো লাগে না। মৃত্যু একটি ভয়াবহ ব্যাপার। সেই মৃত্যু নিয়ে এমনভাবে কথা বলা উচিত নয়।

মহসিন চলে যাবার পরপরই দীপা তৃণাকে টেলিফোন করলেন। তৃণার স্বভাব হচ্ছে টেলিফোন ধরেই হড়হড় করে একগাদা কথা বলা। অন্য কে কী বলছে তা নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই। তুফান মেইলে নিজের সব কথা বলে শেষ করে এক সময় নিশ্বাস ফেলে বলবে 'তারপর আপা, কেমন আছ ?' সেই প্রশ্নের উত্তরও সে ভালোমতো না শুনেই বলবে, 'আপা এখন রাখি, কেমন ? কারো অসুখবিসুখ নেই তো ? খোদা হাফেজ।'

আজও তৃণা টেলিফোন তুলেই হড়হড় করে কথা বলে যাচ্ছে, 'আপা আমি জানি তুমি আমার উপর খুব রাগ করেছ। গত পনের দিনে একবারও তোমাদের খোঁজখবর নিই নি। যা ব্যস্ত ছিলাম বলার না। দু'টা সেমিনার হয়েছে। একটা এপিলেপ্সির উপর, অন্যটা সাইকাডেলিক ড্রাগ। দু'টাই খুব ইন্টারেস্টিং সেমিনার। এত ইন্টারেস্টিং হবে জানলে তোমাকে জোর করে নিয়ে যেতাম। এক আমেরিকান প্রফেসর এসেছিলেন—প্রায় সত্তুরের মতো বয়স—প্রফেসর বার্ন। আমাকে কী বললেন জান ? খুব গম্ভীর গলায় বললেন—মিস তৃণা, আমি কি তোমার সঙ্গে অল্প কিছুক্ষণের জন্যে হলেও প্রেম প্রেম গলায় কথা বলতে পারি ? এরা কেমন রসিক, দেখলে আপা ?'

দীপা কোনো রকমে তাকে থামিয়ে বলল, 'তুই কি আমার এখানে আসতে পারবি ?'

'অবশ্যই পারব। কখন আসব—এখন ?'

'কাল সকালে এলেও হবে। নিশানাথ চাচার ব্যাপারে তোর সঙ্গে পরামর্শ করব।'

'ওঁর অসুখ কি আরো বেড়েছে ?'

'হুঁ। কি সব আজেবাজে কথা বলে—মানুষের মনের কথা বুঝতে পারে, জীবজন্তুর কথা বুঝতে পারে...'

'ব্রেইন সেলের ডিজেনারেশন হচ্ছে—আর কিছু না। আমি সকাল বেলায় চলে আসব। তবে আমাকে দিয়ে তো কিছু হবে না আপা। আমি হচ্ছি ছোট ডাক্তার।'

'হাতের কাছের ডাক্তার সব সময়ই ছোট। যে-ডাক্তার অনেক দূরে, তাকেই মনে হয় অনেক বড়ো।'

'মাঝে মাঝে তুমি ফিলসফির টিচারের মতো কথা বল আপা।'

'ফিলসফির টিচাররা এমন করে কথা বলে, তা তো জানতাম না।'

'আমি তাহলে রাখি আপা? খোদা হাফেজ।—দুলাভাই ভালো আছেন তো?'

'হ্যাঁ, ও ভালোই আছে—ও তোর কথা আজ বলছিল—'

'কি বলছিলেন?'

'অনেক দিন তোর সঙ্গে দেখা হয় না—তুই রাগ করেছিস কিনা এই সব।'

'তৃণা বিস্মিত গলায় বলল, 'গতকালই তো দুলাভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল। রোববারেও দেখা হয়েছে।'

'তাই নাকি! তা হলে হয়তো ভুলে গেছে।'

'দুলাভাইকে একটু দাও তো, কথা বলি।'

'ও বাসায় নেই।'

'কখন ফিরবেন?'

'রাত এগারোটার দিকে ফিরতে পারে। আবার নাও ফিরতে পারে।'

'নাও ফিরতে পারে মানে? রাতে কোথায় থাকবেন?'

'তা তো জানি না। ব্যবসাট্যাবসা নিয়ে কী সব সমস্যা যাচ্ছে।'

তৃণা গম্ভীর গলায় বলল, 'দুলাভাই যদি এগারোটার মধ্যে ফেরেন তাহলে বলবে আমাকে টেলিফোন করতে।'

'আচ্ছা।'

'কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে আপা। খোদা হাফেজ।'

মহসিন রাত এগারোটার মধ্যে ফিরলেন না। দারোয়ানকে গেটে তালা লাগিয়ে দিতে বলে দীপা শেষ বারের মতো নিশানাথ বাবুর খোঁজ নিতে গেলেন।

নিশানাথ চাদর গায়ে দিব্যি ভালো মানুষের মতো বসে আছেন। হাতে স্যুপের বাটি। চামচ দিয়ে স্যুপ তুলে মুখে দিচ্ছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে খুব আনন্দে আছেন।

'চাচা, শরীরটা কি এখন ভালো লাগছে?'

'হ্যাঁ মা। তবে ঘুম-ঘুম ভাব এখনো আছে। স্যুপ খেয়ে আবার শুয়ে পড়ব।'

'সলিড কিছু খাবেন? ভাত-মাছ? খুব ভালো পাঙ্গাশ মাছ ছিল।'

'না মা। দাঁত নেই তো—তরল খাবার ছাড়া অন্য কিছু খেতে পারি না। গলায় আটকে যায়।'

'স্যুপটা কি খেতে ভালো হয়েছে?'

'খুবই ভালো হয়েছে। অতি উত্তম হয়েছে।'

'কাল তৃণা আসবে। ওর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করব আপনাকে হাসপাতালে ভর্তি করব কি করব না। ডাক্তার সাহেব হাসপাতালে নেবার কথা বলছিলেন।'

'বলুক। আমি এখানেই থাকব। বেশি দিন বাঁচব না মা। খুব বেশি হলে এক সপ্তাহ। এই এক সপ্তাহ নিজের ঘরটায় থাকি। পরিচিত জায়গায় মরার একটা আলাদা আনন্দ আছে মা।'

দীপা কিছু বললেন না। তাকিয়ে রইলেন। কী কুৎসিত দেখাচ্ছে মানুষটাকে, দাঁত নেই, চুল নেই, সমস্ত গা ফুলে কী হয়েছে ! অথচ এই মানুষের ভেতরটা যে কত সুন্দর তা তাঁর মতো ভালো কেউ জানে না।

'দীপা।'

'জ্বি চাচা।'

'তোমার কাছে আমার অনেক ঋণ। ঋণ নিয়ে মরতে ভালো লাগে না। তবে তোমার ঋণের জন্যে আমার খারাপ লাগছে না। দেবী অংশে তোমার জন্ম। দেবীদের কাছে ঋণী থাকা দোষের না।'

কথা ঘোরাবার জন্যে দীপা বললেন, 'খাওয়ার পর কি আমি আপনার জন্যে এক কাপ গরম কফি আনব ?'

'আন।'

'কফি এনে দীপা দেখলেন চাদর মুড়ি দিয়ে নিশানাথ বাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন। দীপা তাঁকে জাগালেন না। অসুস্থ বৃদ্ধ মানুষটির জন্যে তাঁর চোখ ভিজে উঠল।

৯

তৃণাকে ডাক্তারের এ্যপ্রনে সুন্দর দেখাচ্ছে। সাদা রঙের গাম্ভীর্য তার চেহারাতেও পড়েছে। তাকে এখন বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে, তবে ছেলেমানুষী পুরোপুরি কাটাতে পারছে না। নিশানাথের কথাবার্তা যদিও সে বিচক্ষণ ভঙ্গি করে শুনছে, তবু বারবার হাসি আসছে। অনেক কষ্টে সে হাসি সামলাচ্ছে। ঘরে আর কেউ নেই। দীপা বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানোর প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। তৃণাকে বলে গেছেন নিশানাথ বাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ব্যাপারটা বুঝতে। তৃণার ধারণা বোঝাবুঝির কিছুই নেই। লোকটির মাথা এলোমেলো হয়ে গেছে। এই বয়সে তা অস্বাভাবিকও নয়। মাথা ঠিক থাকলেই বরং অস্বাভাবিক হ'ত।

নিশানাথ বললেন, 'মা, তোমার কাছে বোধ হয় খুব অবাক লাগছে। তবে ব্যাপারটা সত্যি। আমি মানুষের মাথার ভেতর চলে যেতে পারি।'

তৃণা মনে মনে বলল, 'মাথার ভেতরে কীভাবে যান ? নাকের ফুটো দিয়ে ঢোকেন ? নাকি কানের ফুটো দিয়ে ?' তৃণার ইচ্ছা করছে মনে মনে না বলে শব্দ করেই বলতে। সে তা বলছে না, কারণ অসুস্থ মানুষকে রাগিয়ে দিয়ে লাভ নেই।

'তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করছ ?'

'করছি। করব না কেন ? আপনি কেন শুধু শুধু আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলবেন ?'

'আমি ইচ্ছা করলে তোমার মাথার ভেতরও ঢুকে যেতে পারি। তুমি কী ভাবছ এই সব বলে দিতে পারি।'

তৃণা কপট আতঙ্কের ভঙ্গি করে বলল, 'প্লিজ, এটা করবেন না। আমি অনেক আজেবাজে জিনিস ভাবি। আপনি জেনে ফেললে লজ্জার ব্যাপার হবে।'

নিশানাথ বললেন, 'এটা খুব খাঁটি কথা বলেছ মা। বিনা অনুমতিতে অন্যের মাথায় ঢোকা উচিত না। খুবই গর্হিত কাজ। এই জন্যেই এখন আর সহজে কারো মাথায় ঢুকতে চাই না।'

তৃণা অনেক কষ্টে হাসি চেপে রেখে গম্ভীর মুখে বলল, 'অন্য সমস্যাও আছে। হয়তো কারো মাথায় ঢুকলেন, তারপর আর বেরুতে পারলেন না। সারা জীবনের জন্যে আটকে পড়ে থাকতে হল। কী অদ্ভুত অবস্থা ! আপনার শরীরটা চাদর গায়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে, আর আপনি আটকা পড়ে আছেন অন্য একজনের মাথায়। হতে পারে না এ-রকম ?'

নিশানাথ বাবু ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। তাঁর মনে হল এই চমৎকার মেয়েটা তাঁকে নিয়ে মজা করার চেষ্টা করছে। তাঁর মনটাই খারাপ হয়ে গেল। একবার ইচ্ছা করল মেয়েটার মাথায় ঢুকে গোপন কিছু তথ্য জেনে নিয়ে মেয়েটাকে চমকে দেবেন। পরমুহূর্তেই চিন্তাটা বাতিল করে দিলেন। এটা উচিত না—খুবই গর্হিত কাজ।

তৃণা বলল, 'মানুষের মাথায় ঢোকা ছাড়া আর কিছু কি পারেন ?'

'খুব ভালো চিন্তা করতে পারি। যেমন অঙ্ক মানসাঙ্ক চট করে করে ফেলতে পারি। বড়ো বড়ো ভাগ, গুণ, বর্গমূল—খাতা পেনসিল কিছুই লাগে না।'

'বাহ্, খুব মজা তো !'

'তুমি পরীক্ষা করে দেখ। একটা বিরাট ভাগ অঙ্ক দাও—দেখ, কেমন চট করে উত্তর বলে দেব।'

'আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আমি আপনার সব কথা বিশ্বাস করছি।'

'না, তুমি বিশ্বাস করছ না। দাও একটা অঙ্ক...'

তৃণা খানিকটা বিরক্তি নিয়েই বলল, 'আপনার যখন এতই ইচ্ছা, তাহলে বাইশকে সাত দিয়ে ভাগ দিন। ভাগফলটা আমাকে বলুন।'

নিশানাথ বললেন, 'উত্তর হচ্ছে—তিন দশমিক এক, চার, দুই, আট, পাঁচ, সাত, এক, দুই, চার, চার, নয়, আট, সাত, তিন, দুই, আট, তিন, এক...'

এই পর্যন্ত বলেই নিশানাথ থেমে গেলেন। তৃণা বলল, 'থামলেন কেন ?'

নিশানাথ ক্লান্ত গলায় বললেন, 'এর উত্তর মিলবে না—অনন্ত কাল ধরে চলতেই থাকবে।'

'আপনি কি তা আগেই জানতেন, না এখন টের পেলেন ?'

'এখন টের পেলাম। আগে জানতাম না।'

তৃণা এখন খানিকটা আগ্রহ বোধ করছে, যদিও নিশানাথ বাবুর কথা সে ঠিক বিশ্বাস করছে না। 'পাই'য়ের মান যে মানুষের অজানা তা অনেকেই জানে। হয়তো নিশানাথ বাবুও জানেন।

তৃণা বলল, 'আচ্ছা বলুন তো—আমার এই হাতব্যাগে কী আছে ?' নিশানাথ বিস্মিত গলায় বললেন, 'এটা কী করে বলব ? আমি তোমার মাথার ভেতর ঢুকতে পারি কিন্তু ব্যাগের ভেতর তো ঢুকতে পারি না।

তৃণা এইবার ফিক করে হেসে ফেলল। অবশ্যি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে হাসির রেখা মুছে ফেলে গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি ভেবেছিলাম, যে মানুষের মাথায় ঢুকতে পারে, সে সব জায়গাতেই ঢুকতে পারে।'

'এটা ঠিক না। মানুষের মন বেতারতরঙ্গের মতো। বেতারতরঙ্গ ধরতে রেডিও সেট লাগে। মানুষের মাথা হচ্ছে সে-রকম সেট-রিসিভিং স্টেশন। পশু, কীটপতঙ্গ এরাও এক ধরনের রিসিভিং সেট, তবে খুব দুর্বল।'

'আপনার কথা শুনে খুব ভালো লাগল, এখন তাহলে উঠি ?'

'উঠবে ?'

'হ্যাঁ। আমাকে এগারোটার মধ্যে হাসপাতালে যেতে হবে।'

'ও আচ্ছা। ঠিক আছে মা—তাহলে যাও।'

'আমার তো মনে হচ্ছে এখন আপনার শরীর বেশ ভালো।'

'হ্যাঁ ভালো। সারাদিনে কিছুটা সময় ভালো থাকে—আবার খারাপ হয়। বিশেষ করে সন্ধ্যার দিকে খুব খারাপ হয়।'

'আপনি আজেবাজে জিনিস—যেমন মানুষের মাথার ভেতর ঢোকা এইসব নিয়ে একেবারেই চিন্তা করবেন না। প্রচুর রেস্ট নেবেন। খাওয়াদাওয়া করবেন। আমি এখন থেকে একদিন পরপর আপনাকে এসে দেখে যাব।'

তৃণা দরজা পর্যন্ত গিয়েছে, নিশানাথ ডাকলেন, 'মা, এক মিনিট দাঁড়াও।'

তৃণা থমকে দাঁড়াল। নিশানাথ বললেন, 'এখন আমি তোমার ব্যাগে কী আছে বলতে পারব। তোমার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে অন্যমনস্ক হয়ে তোমার মাথায় ঢুকে পড়েছিলাম। ঢোকামাত্র বুঝতে পারলাম।'

'কী বুঝতে পারলেন ?'

'বুঝলাম যে তোমার ব্যাগে অনেক কিছুই আছে, তবে সে-সব তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। লিপস্টিক, চুলের কাঁটা, একটা চিরুনি, একটা রুমাল...।'

'এসব তো সব মেয়ের ব্যাগেই থাকে।'

'হ্যাঁ, তা থাকে। এই জন্যেই তো বলছি গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। তবে একটা জিনিস আছে, যা নিয়ে তুমি খুব চিন্তিত। একটা খামে বন্ধ চিঠি। এই চিঠি তুমি একজনকে দেবে। তার নাম হারুন। চিঠিটা তুমি অনেকদিন আগেই লিখে রেখেছ—দিতে পারছ না। আজ ঠিক করে রেখেছ, যে করেই হোক তুমি তাকে চিঠিটা দেবে।'

তৃণা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। পুরো ব্যাপারটা তার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। নিশানাথ সহজ গলায় বললেন, 'চিঠির বিষয়বস্তুও আমি জানি।'

'কী জানেন ?'

'এক সময় এই ছেলেটিকে তুমি খুব পছন্দ করতে। তোমরা দু' জন বিয়ে করবে, এ রকম পরিকল্পনা করে রেখেছ। কিন্তু এখন আর ছেলেটিকে তোমার পছন্দ না। মুখ ফুটে বলতে পারছ না বলে চিঠি লিখেছ।'

তৃণা ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আপনি তাহলে সত্যি সত্যি মানুষের মাথায় ঢুকতে পারেন ?'

'হ্যাঁ পারি।'

'অবিশ্বাস্য ব্যাপার !'

'নিশানাথ দুঃখিত গলায় বললেন, 'মানুষের মাথায় ঢোকার ব্যাপারটা অন্যায়। খুবই অন্যায়। খুবই গর্হিত কাজ। তুমি কিছু মনে কর না তৃণা।'

'না, আমি কিছু মনে করি নি। আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না—যদিও জানি আপনার ক্ষমতাটা সত্যি। এর মধ্যে কোনো ভুল নেই। আমি আরেকটু বসি আপনার সঙ্গে ?'

'বস।'

'আপনার খবর প্রকাশিত হলে মেডিক্যাল সায়েন্সের জগতে কী রকম হৈচৈ শুরু হয়ে যাবে, সেটা কি আপনি জানেন ?'

'না। জানি না।'

তৃণা কাঁপা গলায় বলল, 'এই দেখুন আমার গা কাঁপছে। আচ্ছা, আপনি শুরু থেকে বলুন তো—কখন আপনি প্রথম আপনার এই ক্ষমতার কথা বুঝতে পারলেন ?'

নিশানাথ জবাব দিলেন না। তাঁর মাথায় তীব্র যন্ত্রণা আবার শুরু হয়েছে। চারপাশের জগৎ ঘোলাটে হয়ে আসতে শুরু করেছে। তিনি দুর্বল স্বরে বললেন, 'মা, তুমি এখন যাও।'

'আমার পুরো ব্যাপারটা জানতে ইচ্ছা করছে। না জেনে আমি যেতে পারব না।'

নিশানাথ হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'সব তোমাকে বলব। এখন না। এখন পারব না। তোমাকে আমি খবর দেব। আমি নিজে নিজে চিন্তা করে অনেক কিছু বের করেছি। সে সবও তোমাকে বলব। আজ না। অন্য একদিন।'

'কবে সেই অন্য একদিন ?'

'খুব শিগ্‌গিরই। আমার হাতেও সময় নেই। আমি বাঁচব না। বাঁচার আগে কাউকে বলতে চাই। কারো সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই।'

নিশানাথ চাদর দিয়ে নিজেকে ঢেকে ফেললেন। যেন চেনা পৃথিবী থেকে লুকোতে চাচ্ছেন।

তৃণা দীপার খোঁজে রান্নাঘরে ঢুকেছে। দীপা পরিজ তৈরি করছেন—নিশানাথ বাবুর সকালের নাশতা। সকালে চালের আটার রুটি করে দিয়েছিলেন, খেতে পারেন নি। পরিজ খেতে পারেন। তৃণা দীপার পাশে এসে দাঁড়ায়। দীপা বোনের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত গলায় বললেন, 'তোর কী হয়েছে ?'

'কিছু হয় নি তো।'

'তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন ?'

'জানি না। আপা, আমাকে এক কাপ চা করে দাও।'

'তুই হাসপাতালে যাবি না ?'

'বুঝতে পারছি না। হয়তো যাব না।'

'রুগী কেমন দেখলি ?'

'তৃণা জবাব দিল না। তার কথা বলতে ভালো লাগছে না। দীপা বললেন, 'তোর কি শরীর খারাপ লাগছে ?'

'হ্যাঁ।'

'শরীর খারাপ লাগলে উপরে গিয়ে শুয়ে থাক।'

'দুলাভাই কি বাসায় আছেন আপা ?'

'না। ও কাল রাতে ফেরে নি।'

'কখন ফিরবেন ?'

'জানি না।'

তৃণা রান্নাঘর থেকে বেরুল। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ বারান্দায় হাঁটল। তারপর উঠে গেল দোতলায়। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবে। শরীর ভালো লাগছে না। একটু আগে চায়ের তৃষ্ণা হচ্ছিল, এখন তাও হচ্ছে না।

আলো তার শোবার ঘরের অন্ধকার কোণে একটা বই নিয়ে বসে আছে। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় বইটিতে কেন্দ্রীভূত। তৃণা ঘরে ঢুকে এই দৃশ্য দেখল। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে সে এগিয়ে গেল। আলো ছোটখালাকে দেখে জড়সড় হয়ে গেল। ছোট ছোট করে শ্বাস নিচ্ছে, দ্রুত চোখের পাতা ফেলছে। সে কি ভয় পেয়েছে ?

তৃণা নরম গলায় বলল, 'কেমন আছ ?'

আলো চোখ বড়ো বড়ো করে তাকাল। ছোটখালার কথা সে কিছুই বুঝতে পারে নি। শুধু বুঝেছে ছোটখালা তাকে নরম স্বরে কিছু বলেছেন। যা বলেছেন

তাতে আদর ও ভালোবাসা মাখানো। কেউ আদর ও ভালোবাসা মাখিয়ে কিছু বললে আলোর চোখে পানি এসে যায়। তারো ইচ্ছা করে আদর ও ভালোবাসা মাখিয়ে কিছু বলতে। কী করে বলতে হয় তা সে জানে না।

তৃণা আরো কাছে এগিয়ে এল। একটা হাত রাখল আলোর মাথায়। আলোর হাতের বইটি মেঝেতে পড়ে গেল। তৃণা লক্ষ করল মেঝেতে একটা সাদা কাগজ এবং পেনসিল। কাগজে কী সব লেখা। তৃণা কাগজটা হাতে নিল। গোটা গোটা হরফে নানান শব্দ লেখা—

সাফল্য
প্রতিজ্ঞা
শ্রবণ
মন্দির
দিবস

তৃণা লেখার দিকে ইঙ্গিত করে বিস্মিত গলায় বলল, 'এগুলি তুমি লিখেছ ?' আলো এই প্রশ্ন বুঝতে পারল। সে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। তৃণা বলল, 'কেন লিখেছ ?' আলো এই প্রশ্ন বুঝতে পারল না। চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে রইল।

তৃণা কী যেন বলতে গেল। তার আগেই আলো কাগজ টেনে নিয়ে পেনসিল দিয়ে গুটি গুটি করে লিখতে শুরু করল। লেখা শেষ হবার পর তৃণার দিকে কাগজটি বাড়িয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল। তার বড়ো লজ্জা লাগছে।

কাগজে গোটা গোটা করে লেখা—'খালা, আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

এর মানে কী ? মূক-বধির একটি মেয়ে হঠাৎ করে কেন কাগজে লিখবে 'খালা, আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

এর অর্থ কি সে জানে ? কেউ হয়তো এই একটি বাক্য লেখা শিখিয়ে দিয়েছে। অক্ষর-পরিচয়হীন মানুষ যেমন নিজের নাম সই করতে শেখে। হয়তো এও সে-রকম কিছু।

'কে তোমাকে লেখা শিখিয়েছে ?'

আলো প্রশ্নের জবাব দিল না। তৃণার দিকে কাগজ এগিয়ে দিয়ে ইঙ্গিত করল লিখে দেবার জন্যে। বিস্মিত তৃণা লিখল, 'তুমি কি লিখতে পার ?'

আলো উত্তরে লিখল, 'হ্যাঁ।'

'কে তোমাকে শিখিয়েছে ?'

'স্যার।'

'নিশানাথ বাবু ?'

'হ্যাঁ।'

'কখন শেখালেন ?'

এর উত্তরে আলো কিছু লিখল না।

তৃণা লিখল, 'তুমি বই পড়তে পার ?'

'পারি।'

'বই পড়ে বুঝতে পার ?'

'পারি।'

'চশমা কী জান ?'

'চোখে দেয়।'

'প্রতিজ্ঞা কী জান ?'

'না।'

কাগজের খণ্ডটিতে আর লেখার জায়গা নেই। তৃণা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে মেয়েটির দিকে। কী হচ্ছে এ বাড়িতে ? এ বাড়ির মানুষজন কি জানে কী হচ্ছে ?

তৃণা আলোর খাটে শুয়ে পড়ল। তার মাথা ধরেছে। বমি-বমি লাগছে। দীপা চা নিয়ে এসে দেখলেন তৃণা মড়ার মতো পড়ে আছে। তিনি কোমল গলায় বললেন, 'তোর তো মনে হচ্ছে সত্যি শরীর খারাপ। ডাক্তারদের শরীর খারাপ করলে কী ডাক্তার ডাকার নিয়ম আছে ? থাকলে বল—একজন ডাক্তারকে খবর দিই।'

তৃণা উঠে বসতে-বসতে বলল, 'দুলাভাইয়ের সঙ্গে আমার কিছু কথা বলা দরকার আপা। দুলাভাই কখন আসবেন ?'

'ও এসেছে।'

'এসেছেন ? কোথায় ?'

'নিচে। নিশানাথ চাচাকে দেখতে গিয়েছে। ওর সঙ্গে কি কথা বলবি ?'

তৃণা জবাব দিল না। চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগল।

নিশানাথকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না—তিনি জেগে আছেন না ঘুমিয়ে আছেন। ইজিচেয়ারে লম্বালম্বি শুয়ে থাকা একজন মানুষ, যাঁর চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে। বাইরের কেউ হঠাৎ দেখলে চমকে উঠবে। মহসিনের সঙ্গে তাঁর রোজই দেখা হচ্ছে, তবু মহসিন চমকে উঠলেন—কী কুৎসিতই না মানুষটাকে লাগছে ! শরীরে মনে হচ্ছে পানি এসে গেছে। পা দুটো ফোলা। অথচ পায়ের আঙুলগুলো শুকিয়ে পাখির নখের মতো হয়ে আছে। মহসিন মৃদু স্বরে বললেন, 'স্যার কি জেগে আছেন ?'

নিশানাথ খসখসে গলায় বললেন, 'বুঝতে পারছি না বাবা। এখন এমন হয়েছে—কখন জেগে থাকি, কখন ঘুমিয়ে থাকি বুঝতে পারি না।'

'আপনি বিশ্রাম করুন।'

'আর বিশ্রাম, আমি যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছি বাবা। কোথায় যাব তাই-বা কে জানে ?'

মহসিন কিছু বললেন না। মৃতপ্রায় মানুষটির সামনে তাঁর দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে না, আবার চলে যেতেও বাধো বাধো লাগছে।

নিশানাথ বললেন, 'তুমি একটু বস।'

বারান্দায় বসবার জায়গা নেই। মহসিন দাঁড়িয়ে রইলেন। নিশানাথ বললেন, 'আমার গলার স্বরটা কেমন অন্যরকম হয়ে গেছে—তুমি কি লক্ষ করেছ?'

'জ্বি করেছি।'

'নিজের গলার স্বর নিজেই চিনতে পারি না। যখন কথা বলি মনে হয় অন্য কেউ কথা বলছে।'

'আমার মনে হয় কথা না বলে এখন চুপচাপ শুয়ে থাকাই ভালো।'

'সব ভালো জিনিস তো বাবা সব সময় করা যায় না। এখন আমার সারাক্ষণ কথা বলতে ইচ্ছা করে। আমার পরিকল্পনা কি জান? আমার পরিকল্পনা হচ্ছে, মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্ত আমি কথা বলব। মৃত্যু কী এই সম্পর্কে বলব—রানিং কমেন্ট্রি। যখন কথা বলতে পারব না, তখন কারো মাথার ভেতর ঢুকে যাব। তাকে জানিয়ে যাব ব্যাপারটা কী।'

মহসিন আড়চোখে ঘড়ি দেখলেন। একজন অসুস্থ মানুষের আবোল-তাবোল কথা শুনতে তাঁর ভালো লাগছে না। অথচ ওঠে যাওয়াও যাচ্ছে না।

'মহসিন।'

'জ্বি স্যার।'

'আমি একটা পরীক্ষা করতে চাই—বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা।'

'কী পরীক্ষা?'

'আমার যে-অংশ অন্যের মাথায় ঢোকে, সেই অংশের কোনো মৃত্যু আছে কি-না তা জানা। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে ঐ অংশটাও কি মরে যায়, না ঐ অংশ বেঁচে থাকে। যদি বেঁচে থাকে, সে কোথায় থাকে।'

'আমি মনে হয় আপনার কথা পরিষ্কার বুঝতে পারছি না।'

'নিশানাথ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মনে মনে বললেন, 'আমি নিজেই নিজের কথা বুঝি না, তুমি কী করে বুঝবে?'

মহসিন আবার ঘড়ি দেখলেন। আর থাকা যায় না, এবার উঠতে হয়।

'মহসিন।'

'জ্বি স্যার।'

'আমার কথা কি তোমার কাছে পাগলের প্রলাপ বলে মনে হচ্ছে?'

'জ্বি না। তবে আমার মনে হয় এইসব জটিল বিষয় নিয়ে আপনার চিন্তা করা উচিত না। আপনার উচিত চুপচাপ বিশ্রাম করা, যাতে স্নায়ু উত্তেজিত না হয়।'

'মহসিন, আমার মনে হয় তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না। আমার কথাগুলি যে পাগলের প্রলাপ নয়, তা কিন্তু আমি প্রমাণ করে দিতে পারি। খুব সহজেই পারি।'

'আমি তার কোনো প্রয়োজন দেখছি না, স্যার।'

'তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর, এটা আমি চাই। কারণ মৃত্যু কী, তা বোঝার জন্যে আমি তোমার সাহায্য চাই। তোমার সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব নয়। তুমি যদি আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস কর, তাহলেই সাহায্য করবে।'

'আমি আপনার প্রতিটি কথা বিশ্বাস করছি।'

'না, করছ না। আমি এখন তোমার মাথার ভেতর ঢুকব। এছাড়া তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে না।'

মহসিন সাহেব বিরক্তিতে ভ্রূ কোঁচকালেন আর ঠিক কখনই বাঁ দিকের কপালে সূক্ষ্ম যন্ত্রণা বোধ করলেন। এই যন্ত্রণা দীর্ঘস্থায়ী হল না। তিনি বুঝতেও পারলেন না নিশানাথ তাঁর মাথায় ঢুকে গেছেন। মস্তিষ্কের অতলান্তিক কুয়ায় অতি দ্রুত নেমে যাচ্ছেন। কুয়ার গহীন থেকে প্রবল আকর্ষণী শক্তি নিশানাথকে নিচে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এ কী ! তিনি এ কী দেখছেন ?

এটা কি মহসিনের মস্তিষ্ক ? এই কুয়ার চারপাশের দেয়ালে থরে থরে সাজানো স্মৃতিগুলি কি সত্যি তাঁর এককালের প্রিয় ছাত্র মহসিনের ? মৃদুভাষী মহসিন। ছেলেমেয়ের অতি আদরের বাবা। দীপার ভালোবাসার মানুষ। শান্ত, বিবেচক, বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান একজন মানুষ। না-না-না, তিনি যা দেখছেন তা ভুল ! কোথাও কোনো গণ্ডগোল হয়েছে। এটা নিশ্চয়ই অন্য কারোর মস্তিষ্ক।

কারণ এই মস্তিষ্কের মানুষটি খুব ঠাণ্ডা মাথায় একটি খুনের পরিকল্পনা করেছে। খুন করা হবে একটি মেয়েকে, যার নাম দীপা। যে মেয়েটি তারই স্ত্রী। এমন ভাবে হত্যাকাণ্ডটি হবে যে কেউ বুঝতে পারবে না—কেউ সন্দেহ করবে না। শোকে ও কষ্টে মানুষটি ভেঙে পড়ার অভিনয় করবে। তারপর এক সময় শোকের তীব্রতা কমে যাবে। সব স্বাভাবিক হয়ে আসবে। বাচ্চাগুলির দেখাশোনার জন্যেই তখন সবাই তাকে বিয়ে করবার জন্যে চাপ দেবে। সে বিয়ে করবে। এ বাড়িতে একটি মেয়ে এসে উঠবে, যার মাথার চুল ছোট-ছোট করে কাটা, যার গায়ের রঙ শ্যামলা, যার চোখ বড়ো বড়ো, যার নাম নুশরাত জাহান, যাকে আদর করে এই লোকটি 'নুশা' বলে। দীপাকে হত্যা না করেও এই লোকটি 'নুশা'কে ঘরে আনতে পারে। খুব সহজেই পারে। দীপাকে ত্যাগ করলেই হয়। তা সে করবে না, কারণ তাতে সামাজিকভাবে সে হেয় হবে। তার চেয়েও বড়ো কথা দীপাকে ত্যাগ করা মানে দীপার বিশাল সম্পত্তি ত্যাগ করা। এই সম্পদ দীপা তার বাবার কাছ থেকে নিয়ে এসেছে। এর চেয়ে হত্যাই ভালো। কেউ কোনোদিন জানবে না। জানার কোনোই উপায় নেই। কারণ পরিকল্পনা করা হয়েছে ভেবেচিন্তে।

দীপাকে অফিস থেকে একবার টেলিফোন করে বলা হবে—দীপা, আমি একটু বাইরে যাব। আমার নীল স্যুট, লাল একটা টাই আর স্ট্রাইপ-দেয়া শার্টটা কাউকে দিয়ে অফিসে পাঠিয়ে দাও। দীপা তাই করতে যাবে। স্ট্রাইপ-দেয়া সাদা শার্ট যেহেতু ইস্ত্রি নেই, সে ইস্ত্রি করতে বসবে। ঘটনাটা ঘটবে তখন। ইস্ত্রির ভেতরের

তার শর্ট সার্কিট করা থাকবে বডির সঙ্গে। ইন্ডাসট্রিয়াল পাওয়ার লাইটের হাই-ভোল্টেজ তার শরীর দিয়ে প্রবাহিত হবে। সে বড়ো ধরনের চিৎকার করারও সময় পাবে না।

ঘটনাটা কবে ঘটবে ? খুব শিগ্‌গিরই ঘটবে। দেরি করার কোনো মানে হয় না। ইস্ত্রি ঠিকঠাক করে ঝামেলা চুকিয়ে ফেললেই হয়। এত বড়ো একটা ব্যাপার দীর্ঘদিন মাথার উপর চেপে রাখার মানে হয় না... । শিগ্‌গিরই হবে। খুব শিগ্‌গির। হয়তো আজ, কিংবা কাল, কিংবা পরশু।

নিশানাথ মহসিনের মাথা থেকে বের হয়ে এলেন। তিনি আর থাকতে পারছেন না। বার বার মনে হচ্ছিল আর কিছুক্ষণ থাকলে বের হওয়া যাবে না। সারা জীবনের জন্যে আটকা পড়ে যেতে হবে। নিশানাথ হাঁপাচ্ছেন। বড়ো বড়ো করে নিশ্বাস নিচ্ছেন। তাঁর মনে হচ্ছে বাতাস কোনো কারণে অক্সিজেনশূন্য হয়ে পড়েছে।

মহসিন বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কী হয়েছে স্যার ?'

'না, কিছু না।'

'এ-রকম ঘামছেন কেন ?'

'কিছু না, তুমি যাও। ঠিক হয়ে যাবে।'

'ডাক্তারকে খবর দিই ?'

'কাউকে খবর দিতে হবে না। তুমি যাও।'

নিশানাথ চোখ বন্ধ করে থরথরিয়ে কাঁপতে লাগলেন। তিনি কিছুতেই নিজেকে শান্ত করতে পারছেন না। সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এ তিনি কী দেখলেন ? যা দেখলেন তা কি সত্যি না মায়া ? মহসিন খানিকক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে চিন্তিত মুখে চলে এলেন। বসার ঘরে ঢুকে টেলিফোনে ডাক্তারকে খবর দিলেন, যদিও ঘরেই ডাক্তার ছিল। তৃণা যে ঘরে আছে, তিনি জানতেন না।

তৃণা এই মানুষটাকে খুব পছন্দ করে। কেমন ঠাণ্ডা একজন মানুষ। কথা কম বলাও যে এক ধরনের আর্ট, তা এই মানুষটা জানে। বড়ো বড়ো পার্টিতে তৃণা লক্ষ করেছে, তার দুলাভাই একেবারেই কথা বলছেন না। অথচ তিনি যে কথা বলছেন, না চুপচাপ আছেন—তাও ধরা পড়ছে না। এমন নয় যে তিনি কথা বলতে পারেন না। ভালোই পারেন। যখন কথা বলেন মুগ্ধ হয়ে শুনতে হয়।

তৃণা বলল, 'কেমন আছেন দুলাভাই ?'

মহসিন হাসলেন, এই হাসি একসঙ্গে অনেক কথা বলে ফেলল। তৃণা মনে মনে ভাবল আপার মতো ভাগ্যবতী মেয়ে হয় না।

'দুলাভাই।'

'বল।'

'আমার দিকে একটু ভালো করে তাকান তো দুলাভাই।'

'তাকালাম।'

'আমাকে দেখে কী মনে হচ্ছে ?'

মহসিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার উপর দিয়ে একটা বড়ো ধরনের ঝড় বয়ে গেছে।'

'ঠিক ধরেছেন। এখন আন্দাজ করুন ঝড়ের কারণটা কী।'

'আন্দাজ করতে পারছি না। আন্দাজের ব্যাপারে আমি বেশ কাঁচা।'

'তবু আন্দাজ করুন।'

'মনে হচ্ছে তোমার ভালোবাসার কোনো মানুষ তোমাকে হঠাৎ বিনা কারণে ত্যাগ করেছে।'

'হয় নি। কারণটা কি আপনি জানতে চান ?'

'তুমি বলতে চাইলে অবশ্যই জানতে চাই। বলতে না চাইলে জানতে চাই না।'

'আমি বলতে চাই। আপনাকে বলার জন্যেই বসে আছি, নয়তো কখন চলে যেতাম।'

'বল।'

'এখানে না। আমার সঙ্গে বাগানে চলুন।'

'সিরিয়াস কিছু নাকি ?'

'হ্যাঁ, সিরিয়াস। খুব সিরিয়াস। যা বলব আপনি কিন্তু মন দিয়ে শুনবেন। হাসতে পারবেন না।'

'হাসি আসলেও হাসব না ?'

'না। প্রতিজ্ঞা করুন হাসবেন না।'

'প্রতিজ্ঞা করলাম।'

'বলুন—প্রমিস।'

'প্রমিস।'

'তাহলে চলুন বাগানে যাই।'

বাগানে হাঁটতে-হাঁটতে মহসিন তৃণার কথা শুনলেন। তিনি হাসলেন না, বিরক্ত হলেন। তৃণা বলল, 'দুলাভাই, আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করলেন ?'

'না।'

'না, কেন ?'

'মানুষ অন্যের মনের কথা বুঝতে পারে না। থটরিডিং বলে কিছু নেই। ম্যাজিশিয়ানরা মাঝে মাঝে থটরিডিং-এর কিছু খেলা দেখান। তার কৌশল ভিন্ন।'

'ম্যাজিশিয়ানদের থটরিডিং-এর কথা বলছি না দুলাভাই, নিশানাথ বাবুর কথা বলছি। উনি সত্যি সত্যি মানুষের মনের কথা বলতে পারেন। মানুষের মাথার মধ্যে ঢুকে যেতে পারেন।'

'উনি কোনো জীবাণু বা ভাইরাস না যে মানুষের মাথার মধ্যে ঢুকে যাবেন। যা শোন তাই বিশ্বাস কর কেন ? তুমি একজন ডাক্তার, তুমি হবে যুক্তিবাদী।'

'আপনি বুঝতে পারছেন না—আমি যুক্তিবাদী বলেই নিশানাথ বাবুর ক্ষমতা দেখে এত আপসেট হচ্ছি।'

'আপসেট হবার কোনোই কারণ নেই। তুমি বাসায় যাও। ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করে ঘুমাও।'

তৃণা মন খারাপ করে ফেলল। মহসিন বললেন, 'এই পৃথিবী এই গ্রহ-নক্ষত্র চলছে লজিকের ওপর। তুমি যা বলছ, তা লজিকের বাইরে। কাজেই আমরা তা অস্বীকার করব।'

'প্রমাণ দেখলেও অস্বীকার করব ?'

'হ্যাঁ। কারণ তুমি যা প্রমাণ বলে ভাবছ, তা প্রমাণ নয়। প্রমাণ থাকতে পারে না।'

'যদি থাকে ?'

'বললাম তো—নেই।'

মহসিন অফিসে গেলেন না। সারাদিন ঘরেই রইলেন। খানিকক্ষণ বাগানের কাজ করলেন। স্টেরিওতে গান শুনলেন। দীপাকে বললেন, 'চল, আজ রাতে বাইরে কোথাও খেতে যাই। তৃণাও যখন আছে—ভালোই লাগবে। অনেকদিন বাইরে যাওয়া হয় না।'

দীপা বললেন, 'নিশানাথ চাচাকে এই অবস্থায় রেখে বাইরে খেতে যাবার প্রশ্নই ওঠে না।'

'শরীর কি আরো খারাপ করেছে নাকি ?'

'হ্যাঁ। কী সব আবোল-তাবোল বকছেন !'

'আবোল-তাবোল তো সব সময়ই বলতেন, এটা নতুন কি ?'

'এখন যা বলছেন, তার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। এখন আমাকে ডেকে বললেন—মা, খবরদার তুমি ইস্ত্রিতে হাত দেবে না। কোনো ক্রমেই না। ঘরে যে-ক'টা ইস্ত্রি আছে, সব আমার কাছে দিয়ে যাও।'

মহসিন স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তাঁর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হল। দীপা বললেন, 'কী যন্ত্রণা বলতো দেখি ! দুটা ইস্ত্রিই ওঁর কাছে দিয়ে আসতে হয়েছে।'

'তুমি দিয়ে এসেছ ?'

'হ্যাঁ। না দিয়ে কী করব বল ? যা হৈচৈ করছেন।'

মহসিন ঠাণ্ডা মাথায় দ্বিতীয় সিদ্ধান্তই নিলেন। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত নিতে তাঁর খুব বেগ পেতে হল না। তিনি নিজেকে বোঝালেন, অসুস্থ, বৃদ্ধ একজন মানুষের অকারণে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না। এই বৃদ্ধ তো এমনিতেই মারা যাচ্ছে। দু' দিন আগে মারা গেলে কারোর কোনো ক্ষতি হবে না। একজন অথর্ব বুড়োকে হত্যা করাও কঠিন কিছু নয়। সহজ, খুবই সহজ। অনেক পদ্ধতি আছে। সেই অনেক পদ্ধতির যে-কোনো একটি গ্রহণ করা যায়। যেমন নাকের উপর একটা বালিশ চেপে ধরা। দীর্ঘ সময় চেপে ধরার কোনোই প্রয়োজন নেই। দুই থেকে তিন মিনিটের মামলা।

এই মামলা সেরে ফেলা উচিত। মোটেই দেরি করা উচিত নয়। আজ রাতে সেরে ফেলাই ভালো। দেরি করা যায় না। কিছুতেই না।

দীপা বললেন, 'তোমাকে এত চিন্তিত মনে হচ্ছে কেন ?'

'এন্নি। শরীরটা মনে হয় ভালো না।'

'যাও, শুয়ে থাক।'

তিনি শুয়ে রইলেন। ঠাণ্ডা মাথায় তাঁকে ভাবতে হবে। খুব ঠাণ্ডা মাথায়। সময় নেই। হাতে একেবারেই সময় নেই।

দীপা বললেন, 'মাথায় হাত বুলিয়ে দেব ?'

'তিনি বললেন, 'দাও।'

তিনি চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। দীপা মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। আরামে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, কিন্তু তিনি ঘুমুচ্ছেন না। ঘুমুবার উপায় নেই। তাঁকে জেগে থাকতে হবে। ভাবতে হবে ঠাণ্ডা মাথায়। খুব ঠাণ্ডা মাথায়।

১০

রাত দুটার মতো বাজে।

মহসিন খুব সাবধানে বিছানা থেকে নামলেন। দীপা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ঘুমের মধ্যেই সে তৃপ্তির একটা শব্দ করল। খানিকক্ষণের জন্যে তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। একবার মনে হল আবার বিছানায় ফিরে আসবেন। পরমুহূর্তেই সেই পরিকল্পনা বাতিল করে খালি পায়ে সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নেমে গেলেন। খুব সাবধানে দরজা খুলে বারান্দায় এলেন। যদিও এত সাবধানতার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি হাঁটছেন নিজের বাড়িতে। কেউ তাঁকে দেখলেও কিছু যায় আসে না। তিনি যাচ্ছেন নিশানাথের ঘরে। এর মধ্যেও অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। তিনি তো যেতেই পারেন। নিশানাথ একজন রুগী মানুষ। রাত-বিরেতে তাঁকে দেখতে যাওয়াই তো স্বাভাবিক।

নিশানাথের ঘরে ঢোকাও কোনো সমস্যা নয়। তাঁর ঘরের দরজা খোলা থাকে, যাতে সময়ে-অসময়ে তাঁর ঘরে যাওয়া যায়।

মহসিন ছোট-ছোট পা ফেলে এগোচ্ছেন। আকাশ মেঘলা। তাঁর শীত-শীত করছে। পায়েও ঠাণ্ডা লাগছে। চটি জোড়া পরে নিলে হ'ত। নিশানাথ বাবুর ঘরের কাছাকাছি আসতেই তিনি কপালের বাঁ দিকে ভোঁতা এক ধরনের যন্ত্রণা অনুভব করলেন। হালকা যন্ত্রণা। তিনি ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছেন, পারছেন না। যন্ত্রণাটা কেমন করে জানি সারা মাথায় ছড়িয়ে পড়ছে। এর মানে কী ? নিশানাথ কি তাঁর মাথায় ঢুকে পড়েছে ? এও কি সম্ভব ! এটা কি বিশ্বাস্য ?

অসম্ভব নয়। এই অদ্ভুত পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয়। ইস্ত্রির কথা দীপাকে বলা হয়েছে যখন, তখন সম্ভব। অবশ্যই সম্ভব। মহসিন দ্রুত এগিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন। তাঁর হাতে সময় নেই।

সময় নেই নিশানাথের হাতেও। নিশানাথ মহসিনের মাথার ভেতর ঢুকে গেছেন। তাঁকেও অতিদ্রুত কাজ করতে হচ্ছে। মহসিনের মাথা থেকে 'নুশরাত জাহান' নামের মেয়েটির সমস্ত স্মৃতি মুছে ফেলতে হবে। কঠিন কাজ। একটি স্মৃতি দশটি স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। অন্যগুলি নষ্ট না-করে সেই স্মৃতি নষ্ট করা যায় না। স্মৃতির জাল দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম। মাকড়সার জালের মতো তা ছড়ানো। এই জাল থেকে একটি সুতো ছিঁড়ে ফেলতে হবে। এমনভাবে ছিঁড়তে হবে যেন জালের কোনো ক্ষতি না হয়। কঠিন কাজ। অতি কঠিন কাজ হাতে সময় অত অল্প। মহসিনের মনের ভেতর থেকে কুটিল ক্রোধ, ভয়ঙ্কর ঘৃণাও নষ্ট করে দিতে হবে, যেন প্রবল ভালোবাসা জেগে ওঠে দীপা নামের অসাধারণ মেয়েটির দিকে। যে মেয়েটির জন্ম দেবী অংশে। সময় নেই। মোটেই সময় নেই। কঠিন কাজ। ভয়ংকর কঠিন কাজ।

মহসিন নিশানাথের ঘরে ঢুকে পড়েছেন। নিশানাথ কাত হয়ে শুয়ে আছেন। পায়ের কাছে কোলবালিশ। মহসিন কোলবালিশ হাতে তুলে নিলেন। তাঁর হাত একটু কাঁপছে। মাথায় যন্ত্রণা প্রবল হয়ে উঠছে। উঠুক। তিনি তাঁর কাজ শেষ করবেন। সারা জীবন তিনি তাঁর পরিকল্পনা অক্ষরে অক্ষরে কাজে খাটিয়েছেন। আজও খাটাবেন। এর কোনো নড়-চড় হবে না। কিন্তু মাথা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। বড্ড অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। বমি-বমি ভাব হচ্ছে। হোক। যা ইচ্ছা হোক। তিনি নিচু হয়ে নিশানাথের মুখের উপর বালিশ চেপে ধরলেন।

সময় শেষ হয়ে এসেছে। আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত। নিশানাথ মৃত্যুর স্বরূপ বুঝতে পারছেন। বড়োই আফসোস, কাউকে তা জানাতে পারছেন না। কারণ তাঁর কাজ শেষ হয় নি। এখনো কিছু কাজ বাকি আছে। মহসিন এই মুহূর্তে একটি খুন করছে। এই খুনের স্মৃতিও তার মাথা থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। এই ভয়াবহ স্মৃতি নিয়ে সে স্বাভাবিক মানুষের জীবনযাপন করতে পারবে না। এই স্মৃতিও নষ্ট করতে হবে। সময় নেই। এক অণুপল সময়ও নষ্ট করা যাবে না। আহ্, যদি কিছু সময় থাকত, তাহলে মৃত্যুর স্বরূপ অন্য কাউকে বলে যেতে পারতেন। শুধু একটি কথা যদি বলতে পারতেন—যদি জানিয়ে যেতে পারতেন মৃত্যু ভয়াবহ নয়, কুৎসিত নয়। মৃত্যুর সৌন্দর্য জন্মের চেয়েও কোনো অংশে কম নয়। কাকে জানাবেন ? মহসিনকে ? মন্দ কি ? কেউ একজন জানুক।

মহসিন সাধারণত খুব ভোরবেলায় জাগেন। আজ ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। দীপা ডেকে তুলে বললেন,—'তোমার একটা জরুরি টেলিফোন। মহসিন আধো ঘুমে টেলিফোন রিসিভারে মুখ লাগিয়ে বললেন, 'কে ?'

ওপার থেকে মধুর স্বরে বলা হল, 'আমি।'

'আমিটা কে ?'

'আমি নুশরাত জাহান—নুশা।'

'নুশা মানে ?—নুশা কে ?'

ওপাশ থেকে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলা হল, 'আমি তোমার নুশা।'

মহসিন বিস্মিত ও বিরক্ত হলেন।

'তুমি এমন করছ কেন ? আমি নুশা।'

মহসিন টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। বিছানার পাশে দীপা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চোখ জলে ভেজা। সেই দিকে তাকিয়ে মহসিনের মন মায়ায় ভরে গেল। এত গভীর মায়া, এত গভীর মমতা তাঁর ভেতর আছে, তা তিনি কখনো বোঝেন নি। এই মমতার উৎস কী ? তিনি হাত বাড়িয়ে দীপাকে স্পর্শ করলেন। দীপা নিচু গলায় বলল, 'নিশানাথ চাচা কাল রাতে মারা গেছেন।'

দীপার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে। মহসিনের চোখও ভিজে উঠল। তিনি গভীর বেদনা বোধ করলেন। ফিসফিস করে বললেন, 'মৃত্যু নিয়ে মন খারাপ করতে নেই দীপা। মৃত্যুও আনন্দময়। আমরা জানি না বলেই ভয় পাই।'

এইটুকু বলেই তিনি চমকে উঠলেন। কেন এ রকম একটা অদ্ভুত কথা বললেন, ভেবে পেলেন না। তাঁর মনে হল, এই কথাগুলি স্বপ্নে পেয়েছেন। হ্যাঁ, অদ্ভুত একটা স্বপ্ন তিনি কাল রাতে দেখেছেন। যেন খুব একটা শীতের রাত—খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে কোথায় যেন যাচ্ছেন। কোথায় যাচ্ছেন ?

দীপা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। তাঁর গাল অশ্রুতে ভেজা। মহসিন সেই অশ্রু মুছিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন। তিনি গাঢ় স্বরে ডাকলেন, 'দীপা।'

দীপা কিছু বলল না।

তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি দীপা। এ রকম করে কেঁদ না। আমার কষ্ট হচ্ছে। সত্যি কষ্ট হচ্ছে।'

বলতে-বলতে সত্যি-সত্যি তাঁর চোখে জল এসে গেল। এই পৃথিবীতে চোখের জলের মতো পবিত্র তো আর কিছু নেই। এই পবিত্র জলের স্পর্শে সব গ্লানি—সব মালিন্য কেটে যায়।